আপন প্রিয়

আপন প্রিয়

রমাপদ চৌধুরী

ত্রিবেণী প্রকাশন

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৮

প্রকাশক
শ্রীকানাইলাল সরকার
১৭৭এ, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৪

মুদ্রক
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

বাঁধাই
ইতফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

প্রচ্ছদ শিল্পী
রণেন অয়ন দত্ত

দাম তিন টাকা।

আতাউর রহমান

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের

লালবাঈ

দরবারী

প্রথম প্রহর

পিয়াপসন্দ্

রূপযানী

প্রীতি ভালবাসা কোন নিয়ম মানে না, কোন যুক্তির বশ নয়। 'আপন প্রিয়' সংগ্রহের জন্যে গল্প বাছাই করতে গিয়ে এ-কথা'টাই নতুন করে মনে হলো। ইতিপূর্বে প্রিয়াদের পছন্দসই গল্প নিয়ে বেরিয়েছিল 'পিয়াপসন্দ্' সঙ্কলন। 'আপন প্রিয়' আমার নিজের কাছে যেগুলি প্রিয় সেই গল্পগুলির সংগ্রহ। প্রিয় গল্প শ্রেষ্ঠ গল্প নয়, স্বনির্বাচিত গল্পও নয়। কোন একটি রচনা লেখকের কাছে প্রিয় হয় নানা কারণে। হয়তো লেখকের জীবনের কোন সত্যকার অভিজ্ঞতা, চোখে-দেখা চরিত্র বা ভুলতে-না-পারা ঘটনা জড়িয়ে থাকে সে-রচনার সঙ্গে। আবার কোনটা হয়তো সাহিত্যসাধনার হাতেখড়ির সময়কার রঙিন দিনগুলিকে মনে পড়িয়ে দেয় বলেই এত প্রিয়। প্রিয় নির্বাচনের তাই কোন নিয়ম নেই, কোন যুক্তি নেই। এ গ্রন্থের কোন গল্পই 'দরবারী' বা 'পিয়াপসন্দ্' থেকে তুলে আনা হয়নি। 'তিনতারা' আমার প্রথম প্রকাশিত বই, প্রথমে 'চতুরঙ্গে' এবং পরে বই হয়ে বের হওয়ার পর অনেক কাল ছাপাখানার মুখ দেখেনি। গল্পটির আদিরূপটি এ সংস্করণে দেওয়া হলো। এবং 'ঝুমরা বিবির মেলা' বইটি পুনর্মুদ্রিত হবে না বলেই সে সঙ্কলনেরও কয়েকটি গল্প সংযোজিত হলো।

রাঙা পিসীমা	...	১
রেবেকা সোরেনের কবর	...	১২
তীর-ধনুক	...	৩৫
সতী ঠাকরুণের চিতা	...	৫১
নকলচি	...	৬৩
বাসুকি বসুন্ধরা	...	৭১
ঝড়	...	৯০
এক খিলি মিঠে পান	...	৯৯
ঝুমরা বিবির মেলা	...	১০২
কঙ্কণকন্যা	...	১১৮
তিনতারা	...	১৪২

রাঙা পিসীমা

বেলেঘাটার অনাদি দস্তিদার লেনের সতেরোর এক বাড়িটা আপনারা কেউ দেখেছেন কিনা জানি না। যদি কোনদিন বেলেঘাটায় যান, হাতে সময় থাকলে অনাদি দস্তিদার লেনে খোঁজ করবেন। তারপর অনাদি দস্তিদার লেনে ঢুকে বাঁদিকের ফুটপাত ধরে পরপর সতেরোটা নম্বর পার হয়ে এসে বাগানওয়ালা প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি দেখতে পাবেন।

পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নির্জন বাড়িটার দিকে তাকালে দিনের বেলাতেও আপনার গা ছমছম করবে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন বাঁদিকের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা আছে সতেরোর এক, কিন্তু ফটকের ডান দিকে দেখতে পাবেন একটা মার্বেলের ফলক। ফুলপাতা আঁকা নামটা লেখা আছে তার ওপর। নাম অনাদি-নিবাস।

অনাদি-নিবাসের পাঁচিল অবশ্য ধসে পড়েছে এখন, লোহার ফটকে জং ধরেছে। আর বাগান? হ্যাঁ, এককালে বেশ সাজান বাগানই ছিল। এখন চোরকাঁটার ঝোপের মধ্যে শুধু একটা মার্বেলের মূর্তি।

অনাদি-নিবাসের জানালাগুলো আজ সাত বছর খোলা হয়নি, প্লাস্টার খসে খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে দেয়ালে শ্যাওলা জমে এমন চেহারা হয়েছে যে ভূতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হবে।

পাড়ার লোক নাকি মাঝরাতে ওবাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসতে শুনেছে। কেউ-কেউ বলে, সাদা ধবধবে থান পরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে নাকি জ্যোৎস্না রাতে ওবাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়।

সত্যিমিথ্যে জানি না, তবে সন্ধ্যের পর অনাদি-নিবাসের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে যেতেও সাহস পায় না।

এতবড় একটা বাড়ি, অথচ কেউ নাকি কোনদিন অনাদি-নিবাসে আলো জ্বলতে দেখেনি, মানুষ ঢুকতে বা বেরুতে দেখেনি। শুধু কার্নিসের ওপরে বসে একরাশ পায়রা বকম্ বকম্ করে, আর কার্নিসের নীচে চামচিকের রাজত্ব। তাই, গাড়িবারান্দার ঠিক ওপরে দুটো পরীর মাঝখানে যদিও ইংরেজীতে লেখা আছে ১৯০২, তবু বাড়ির চেহারা দেখে মনে হয় সিরাজুদ্দৌল্লার সঙ্গে ক্লাইভের যুদ্ধ হওয়ার সময়েই বুঝি অনাদি-নিবাসের পত্তন।

আমি একসময় এই অনাদি-নিবাসের, এই সতেরোর এক অনাদি দস্তিদার লেনের বাসিন্দে ছিলাম। আরও দুটি কলেজের ছাত্রের সঙ্গে আমিও সেদিন আশ্রয় পেয়েছিলাম রাঙা পিসীমার।

বাড়ির সরকার মশাই থেকে শুরু করে আমরা সবাই তাঁকে রাঙা পিসীমা-ই বলতাম। আশ্রিত লোক ওবাড়িতে তখন কম ছিল না। আত্মীয়ের মধ্যে রাঙা পিসীমার এক বিধবা ননদ, যাঁকে আমরা বুড়িদি বলতাম; রাঙা পিসীমার এক মামা, যাঁকে আমরাও মামাবাবু বলতাম; আর বুড়িদির আধ-ডজন ছেলেমেয়ে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মেয়েটার নাম ছিল মিনু।

রাঙা পিসীমা থাকতেন দোতলার একটি ঘরে; বুড়িদি কিংবা মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হত, দু'চারটি কথা হত শুধু ভোর বেলায় যখন গঙ্গাস্নানে যেতেন।

রাঙা পিসীমার চেহারা ছিল মা দুগ্গার মত। লম্বা দোহারা

গড়ন, ফর্সা ধবধবে রঙ, নাকের ওপর গঙ্গামৃত্তিকার রসকলি। লাল পাড় গরদের সাড়ি পরতেন সবসময়, গায়ে থাকত একটা নামাবলী। কানের পাশে চুল তাঁর তখনই অর্ধেক সাদা হয়ে গেছে।

এমন রূপ, কিন্তু সরকার মশাই বলেছিলেন, রাঙা পিসীমার মত তুঃখের জীবন নাকি কারও হয় না।

তুঃখটা কিসের জানতে পারলাম হঠাৎ একদিন। কলেজ থেকে সবে ফিরেছি, মিনু এসে বললে, মামীমা তোমাদের ডাকছে।

আমরা তিনজন আশ্রিত বালক সুড় সুড় করে দোতলায় উঠে গেলাম।

গিয়ে দেখি বাক্স বিছানা বাঁধা হচ্ছে, রাঙা পিসীমা কোথাও যাবেন হয়ত।

বাক্স গুছোতে গুছোতে ফিরে তাকিয়ে বললেন, তু'দিনের জন্যে কাশী যাচ্ছি, একটু সাবধানে থাকিস তোরা।

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লাম।

আবার বললেন, কিছু অসুবিধে হলে তোদের বুড়িদিকে বলিস, কেমন?

এবারও ঘাড় নাড়লাম।

তারপর একসময় ফিটনে চড়ে রাঙা পিসীমা চলে গেলেন। আর রাঙা পিসীমা চলে যেতেই মিনু এসে ফিসফিস করে বললে, মামীমা কোথায় গেলেন, জান?

উত্তর দিলাম, কোথায় আবার, তীর্থে।

মিনু বেণী তুলিয়ে মাথাটা একবার বাঁদিকে, একবার ডানদিকে হেলিয়ে বললে, উঁহু। কিচ্ছু জান না।

বললাম, কোথায় গেলেন তবে?

মিনু ফাজিল মেয়ের মত হাসি চেপে বললে, বরকে খুঁজতে।

আমার ছোটমামা ত নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, তাঁকে খুঁজতে গেলেন।

মিনুর কাছেই সেই প্রথম শুনলাম রাঙা পিসীমার ইতিহাস।

পনেরো বছর বয়েসে নাকি বিয়ে হয়েছিল রাঙা পিসীমার। ভাল ঘরে, ভাল পাত্রে। কিন্তু বিয়ের আগে যেটা ভাল মনে হয়েছিল সেটাই হল কাল। এমন সুন্দরী বৌ, এমন রাজার মত ঐশ্বর্য, কিন্তু রাঙা পিসীমার স্বামীর নাকি এ-সবের দিকে টান ছিল না। টান ছিল এক তান্ত্রিক গুরুর দিকে। পুজোআর্চা করতেন, তারপর হঠাৎ একদিন উধাও। আবার ফিরে আসতেন দু'দশ দিন পরে।

প্রথম প্রথম সবাই খোঁজাখুঁজি করত, কিন্তু তারপর তাও বন্ধ হল। সকলেই জানত, দুদিন পরেই ফিরে আসবেন। কেউ বলত, মাথায় ছিট আছে, কেউ বলত, ও জন্মবৈরাগী, গেরুয়া দেখলেই ওঁর মন ঘর ছেড়ে পালাতে চায়। উনি ঠিক সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবেন একদিন।

শেষ পর্যন্ত হলও তাই। বিয়ের পর তিনটে বছরও কাটেনি তখন, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন রাঙা পিসীমার স্বামী।

রাঙা পিসীমাও ভেবেছিলেন, মাসখানেক পরেই ফিরে আসবেন।

কিন্তু মাস থেকে বছর কেটে গেল, তবু ফিরে এলেন না। তখন সরকার মশাইকে পাঠান হল তারকেশ্বরে সেই তান্ত্রিকের আশ্রমে।

সরকার মশাই মুখ কালো করে ফিরে এলেন। না, পাওয়া যায়নি দু'জনের একজনকেও। না তান্ত্রিককে, না রাঙা পিসীমার স্বামীকে।

মুখ শুকিয়ে গেল রাঙা পিসীমার, সবাই বিব্রত হয়ে উঠল। চিঠির পর চিঠি গেল আত্মীয়স্বজনদের নামে, কেউ যদি হদিস দিতে পারে। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারল না।

গয়া, কাশী, বৃন্দাবন—তীর্থে তীর্থে ঘুরে এলেন রাঙা পিসীমা, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কি হারানো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়?

রাঙা পিসীমার মুখের হাসি নিভে গেল। সেই যে পুজোর ঘরে ঢুকলেন, তারপর থেকে শুধু নামকীর্তন আর পুজোপার্বণ। বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথাবার্তাও একরকম বন্ধ হয়ে গেল, মেলামেশা বন্ধ হল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে।

ফিসফিস করে রাঙা পিসীমার ইতিহাস বলছিল মিন্টু, সমবেদনায় ওর গলার স্বরও বুঝি ভারি হয়ে এসেছিল। এমন সময় হঠাৎ বলে উঠল, এই রে, সরকার মশাই···

বলেই ছুটে পালাল।

সরকার মশাই ঘরে ঢুকেই পটপট করে জামার বোতাম কটা খুলে দিয়ে হাতপাখাটা নিয়ে বুকে হাওয়া করতে শুরু করলেন।

তারপর হঠাৎ যেন নিজের মনেই বললেন, এই নিয়ে বোধ হয় তুশো পুরো হল।

বুঝতে না পেরে তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

উত্তর এল, তু'শো বার, তুশো বার এমনি উড়ো খবর এসেছে। আত্মীয়-স্বজন কেউ গয়া কি বৃন্দাবন বেড়াতে গেছে, আর সেখান থেকে চিঠি লিখেছে, সাধুদের আড্ডায় দেখলাম, মনে হল যেন অমুক। রাঙা পিসীমাও তেমনি মানুষ, যে যা বলে বিশ্বাস করে বসেন। আর যত ঝামেলা আমার, 'সরকারমশাই! ব্যবস্থা করে দিন, যাই একবার স্বচক্ষেই দেখে আসি।'

জিজ্ঞেস করলাম, এবারও বুঝি খবর পেয়েই গেলেন?

সরকার মশাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ। তু'শোবারই খবর পেয়ে গেছেন, কিন্তু কখনো হয়ত সাধুর হদিসুই মেলেনি, কখনো গিয়ে দেখেছেন সম্পূর্ণ অন্য লোক। এবারও দেখো, তাই হবে।

সরকার মশাই যা বলেছিলেন তাই হল। দিনকয়েক পরেই থমথমে মুখ করে ফিরে এলেন রাঙা পিসীমা। পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যে যাবে না তা যেন সকলেই জানত। জানতেন না শুধু রাঙা পিসীমা।

আগের মতই আবার তেমনি নামাবলী গায়ে দিয়ে নাকে কপালে গঙ্গামাটির তিলক কেটে গুন্‌গুন্ করে গান শুরু করলেন সকাল থেকে সন্ধ্যে।

হঠাৎ একদিন দেখি কি, দোতলার বারান্দায় একজন জ্যোতিষীর সামনে বসে একমনে কি যেন শুনছেন রাঙা পিসীমা।

সরকার মশাই হেসে বললেন, ঐ ত কাজ। একবার শুনলে হল অমুক জায়গায় ভাল জ্যোতিষী আছে, অমনি হুকুম হবে 'যান ত সরকার মশাই, একবার নিয়ে আস্থন তাঁকে।'

সেদিনও এমনি রাগে গজগজ করতে করতে সরকার মশাই এসে হাজির হলেন। বললেন, আমার হয়েছে যত ঝামেলা, কে খবর দিয়েছে বাঁশবেড়েতে ভাল গণৎকার আছে, তাকে আনতে হবে এখন।

সরকার মশাই চলে গেলেন, আর মিনুর কাছে শুনলাম ব্যাপারটা।

দিনের পর দিন এমনি একজন না একজন জ্যোতিষী আসে। নিজের আর স্বামীর দু'খানা কুষ্ঠী মেলে ধরে আলোচনা হয়। আজেবাজে অনেক কথা বলে যায় গণৎকার, কিন্তু সে দিকে কান থাকে না রাঙা পিসীমার। শুধু একসময় ফিস্‌ফিস্ করে জিগ্যেস করেন, দেখুন ত ভাল করে উনি কবে ফিরে আসবেন।

এক একজন এক একটা তারিখ বলে, তা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রাঙা পিসীমা। হয়ত পাঁজি দেখে দিন গোনেন, তারপর সে-তারিখ পার হয়ে যায়। কেউ আসে না। ফিরে আসে না রাঙা পিসীমার স্বামী।

তখন আবার নতুন জ্যোতিষীর খোঁজ পড়ে।

এমনি ভাবেই বছরের পর বছর কেটে গেছে রাঙা পিসীমার. এমনি ভাবেই বছর কেটে চলে। কখনো স্বামীর খোঁজে তীর্থে তীর্থে ছুটে বেড়িয়ে, কখনো জ্যোতিষীর দেওয়া তারিখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। পনেরো বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল রাঙা পিসীমার, স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছিল তাঁর আঠারো বছর বয়েসে। তারপর তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে করতে কখন তাঁর কানের পাশে চুল সাদা হয়ে গেছে, মুখে বয়সের রেখা পড়েছে তা বোধহয় রাঙা পিসীমা বুঝতেও পারেননি।

এমন সময় হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় হৈ চৈ হট্টগোল শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

শব্দ শুনে ভেতর-বারান্দায় ঢুকে দেখি ঝি চাকর সরকার মশাই সবাই আনন্দে হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। আর হাসি মুখে প্রৌঢ় গোছের একটি গেরুয়া-পরা লোক গাড়ুর জলে পা ধুচ্ছে। সকলেই যেন লোকটাকে তোয়াজ করতে ব্যস্ত।

কেউ রুলের জন্যে ফরমাশ করল, কেউ তোয়ালে এনে দিল, কেউ বা আসন পেতে দিল।

সরকার মশাইকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে বললাম, কে উনি, নতুন জ্যোতিষী বুঝি?

একগাল হেসে সরকার মশাই বললেন, বড়বাবু গো, রাঙা পিসীমার স্বামী।

ফিরে এসেছেন? বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন দপ করে উঠল। তা হলে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে ফিরে পেলেন রাঙা পিসীমা? আনন্দে সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। এ যেন শুধু রাঙা পিসীমার আনন্দ নয়, আমাদেরও আনন্দ।

খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল বুড়িদি। টিপ করে একটা

প্রণাম করে বললে, এতকাল পরে আমাদের মনে পড়ল দাদা।

রাঙা পিসীমার স্বামী আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে লজ্জার হাসি হাসলেন।

মামাবাবুও ছুটে এলেন, পরস্পর পরস্পরের কুশল প্রশ্ন করলেন।

মিনুরা আধ-ডজন ভাইবোন ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল, বুড়িদির ইশারায় তারা একে একে এসে প্রণাম করল।

এমন সময় সরকার মশাই বলে উঠলেন, আরে, আসল লোকই যে আসেনি। রাঙা পিসীমাকে

তাই ত! রাঙা পিসীমা কি এখনও ওপর ঘরে? কিছুই জানেন না?

সরকার মশাই আমাকেই কাছে পেয়ে বললেন, যাও যাও খবর দিয়ে এস।

ছুটে গেলাম। এমন একটা শুভসংবাদ জানাবার ভার পেয়ে যেন খুশি হয়ে উঠলাম। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিয়ে ওপরে তাকাতেই চমকে উঠলাম।

পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাঙা পিসীমা। ঠিক সিঁড়ির মাথায়।

আমাকে দেখতে পেয়েছেন মনে হল না। মুখের ভাব বদলাল না একটুও।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলাম, কিন্তু রাঙা পিসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রাঙা পিসীমা বললেন, চল্।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেন রাঙা পিসীমা, বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সবাই দূরে সরে গেল।

স্থির চোখে গেরুয়া-পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাঙা পিসীমা।

তারপর বললেন, এ কে? এ কে সরকার মশাই? আমি ত চিনতে পারছি না।

সকলেই চমকে উঠল।

সবকার মশাই বললেন, চিনতে পাবছেন না কি রাঙা পিসীমা, বড়বাবু, বড়বাবু আমাদের।

রাঙা পিসীমা গম্ভীর গলায় বললেন, না।

বুড়িদি চিৎকার করে উঠল, দাদা, দাদাকে চিনতে পারছ না?

তেমনি গম্ভীর গলাব উত্তর এল, না।

মামাবাবুও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই রাঙা পিসীমা চিৎকার কবে উঠলেন, না, না, সে নয়, সে নয়। দূর করে দাও ওকে, দূর করে দাও।

বলেই ছুটে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন রাঙা পিসীমা। সশব্দে কপাট বন্ধ করে দিলেন।

গেরুয়া-পরা লোকটার মুখখানা ম্লান দেখাল। অভিমানের স্বরেই চলে যেতে চাইলেন তিনি। বুড়িদি, মামাবাবু, সরকার মশাই অনেক বোঝালেন, তারপর নীচের একখানা ঘরে বিছানা পেতে দিলেন তাঁর জন্যে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

রাঙা পিসীমা কিন্তু কপাট খুললেন না সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সন্ধ্যে বেলায় একা একা গিয়ে টোকা দিলাম দরজায়। কপাট খুলে দিলেন রাঙা পিসীমা।

দেখলাম, দেখে শিউরে উঠলাম। এক বেলার মধ্যে এ কি চেহারা হয়েছে রাঙা পিসীমার!

বুঝলাম, সারাটা দিন কেঁদেছেন পড়ে পড়ে।

রাঙা পিসীমা চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলেন, চলে গেছে? চলে গেছে সে?

বললাম, না।

চিৎকার করে উঠলেন রাঙা পিসীমা।—চলে যেতে বল্, চলে যেতে বল্ এখুনি।

যেন রাগে ফেটে পড়লেন।

বললেন, যার কথা সারা জীবন ভেবেছি, যার খোঁজে সারা জীবন কেটে গেছে, সে যদি সত্যিই একদিন এসে হাজির হয়, একেবারে অন্য চেহারা নিয়ে সত্যিই যদি ফিরে আসে, সে যে কি অসহ্য তোরা বুঝবি না, তোরা বুঝবি না। ওরে আজ বুঝতে পেরেছি, তার কথা ভাবতে চাই, তাকে চাই না আর।

বলে আবার বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন রাঙা পিসীমা।

আর রাঙা পিসীমাকে ডাকতে গিয়ে দেখলাম, বিছানার ওপর বড় একখানা ফটো পড়ে রয়েছে। দেখেই বুঝলাম, রাঙা পিসীমার স্বামীর ছবি। একুশ বাইশ বছরের একটি সুন্দর মুখ সে ছবিতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আপনা থেকেই। বুঝতে পারলাম, যে চলে গিয়েছিল, তার সঙ্গে যে ফিরে এসেছে, তার কোন মিল নেই। কোন মিল নেই। মানুষটাই শুধু

তবু, গেরুয়া-পরা লোকটাকে, রাঙা পিসীমার স্বামীকে বুড়িদি, মামাবাবু, সরকার মশাই ধরে রাখলেন।

সকলেরই বিশ্বাস ছিল রাঙা পিসীমার রাগ পড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরের দিন ভোরবেলায় গঙ্গাস্নান করতে সেই যে বেরিয়ে গেলেন রাঙা পিসীমা আর ফিরে এলেন না।

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে সরকার মশাই বেরিয়ে গেলেন রাঙা

পিসীমার খোঁজে। আত্মীয়স্বজনদের কাছে চিঠি লেখা হল, থানায় খবর দেওয়া হল, কিন্তু হদিস মিলল না রাঙা পিসীমার।

মাসখানেক পরে পরীক্ষা পাশ করে জব্বলপুরে চলে গিয়েছিলাম একটা চাকরি নিয়ে। সেখান থেকে বছর কয়েক পরে ফিরে এলাম।

সেদিন হঠাৎ গিয়ে দেখি, লোহার ফটকে একটা বড় তালা ঝুলছে, মরচে ধরে গেছে তালাটায়।

ও বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করতে চোখ কপালে তুলল আশ-পাশের লোক। বললে, সে কি, ও বাড়িতে লোক ছিল নাকি কখনো? ও তো ভূতুড়ে বাড়ি!

কেউ বললে, মাঝরাতে কান্নার শব্দ ভেসে আসে অনাদি-নিবাস থেকে; কেউ বললে, জ্যোৎস্না রাতে ও বাড়ির ছাদে ফুটফুটে একটি মেয়ে সাদা থান পরে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আমি জানি, ও বাড়ির হাওয়ায় যদি কোন নারীর প্রেতাত্মাও থাকে, তাকে মানুষ ভয় পাবে না, তার দুঃখে চোখে জল আসবে।

রেবেকা সোরেনের কবর

আশপাশের পাঁচটা কোলিয়ারির ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার বুকে। কারানপুরা—যার আদি নাম কর্ণপুর।

কিংবদন্তী শোনা যায়, মহাভারত-চরিত্র কর্ণের রাজধানী ছিলো এটা। দুসাদ দুবে মাহাতো সিংরা শুধু বলেই খালাস নয়। পাহাড়ের গায়ে এক সারি প্রাচীন গুহার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানায়, এ হলো কর্ণের দরবার। অরণ্যচর বীরহড়দের যে দলটা তীর ছোঁড়ার সময় বুড়ো আঙুলটা মুড়ে রাখে তাদের দেখিয়ে বলে, একলব্যের বংশধর ওরা।

কে কি বলছে,না বলছে, জংলা ডেরার সান্তালরা অবশ্য তার খোঁজ রাখে না। খোঁজ রাখে না, তবে রাখে কান। ঢেঁড়া কাঠির ডুগডুগির দিকে। সে ডুগডুগি মাঝে মাঝে জানিয়ে দেয়, লোক লাগবে বাঁশরিয়ার খাদানে, কিংবা নাটুয়া দল তাঁবু ফেলেছে ঝিন্‌কাগাড়ায়।

এমনি এক ডুগডুগির ডাক শুনেই মেয়েমরদের ভিড় ভেঙে পড়লো কারানপুরার রামলীলার মাঠে।

ভিখারিয়ার নাচ এসেছে, ভিখারিয়ার নাচ। নামে নাচ, আসলে গান। কানে আঙুল দেওয়া কবিগানের লড়াই। যা শোনবার আগ্রহে আঠারো ক্রোশ পথ হাঁটতেও উৎসুক হয়ে উঠে দেহাতীরা, কোলিয়ারির হড় হো ভুম্পি খাড়িয়া রেজাকুলির দল।

তাই ডুগডুগি শুনতে না শুনতে প্লাবন নামলো রামলীলার মাঠে, কুলি কামিন আর জোয়ান সাণ্ডা, বাচ্চা বুড়ো হাড়াম হপন্, সবাই।

ভিড়ের মুখে গা ভাসিয়ে রূপমতীও এসে পৌঁছলো। পৌঁছলো যখন, তোতা আর ম্যোর ভিখারিয়া ছাড়েনি তখনও।

'ভিখারিয়া হলো গ্রামের নাম, তা থেকে ভিখারিয়ার নাচ।' বোঝালেন কারানপুরা কোলিয়ারীর কম্পাসবাবু।

মারাঠী ম্যানেজার সাঠে সাহেব মাথা নাড়লেন। ও তল্লাটের চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ডিক্‌সন আর এজেন্ট ফার্নহোয়াইট চুরুট চাপা ঠোঁটে বললেন, আই সী!

সব কৃতিত্বটুকু কম্পাসবাবুই নিয়ে নিচ্ছেন দেখে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে এলেন মিশ্রীবজী। বললেন, তোতা পাখী আর ময়ূর সেজে দু'জন লোক আসবে এখনি, নাটকটার কাহানী বলে দেবে।

কাহানী? ফার্নহোয়াইট ভুরুতে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

নিমন্ত্রিত সাহানা বললেন, কাহানী না ছাই। ভিলেজ স্ক্যাণ্ডাল, যত সব কেচ্ছা ভিন গাঁয়ের মেয়েদের নামে। ছড়া বেঁধে গাইবে ওরা, আর পারে তো সে গাঁয়ের লোক জবাব দেবে গান গেয়ে। না পারে তো লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে উঠবে।

মিশ্রীরজী সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ স্যার। ভিখারিয়ার নাচ হয়েছে অথচ দু'চারটে খুন-জখম হয়নি এমন ঘটনা আমরা অন্তত শুনিনি।

বলতে না বলতেই হৈ হৈ চিৎকার উঠলো ওদিক থেকে।

না। মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপার নয়। তোতা আর ম্যোর দেখা দিয়েছে বাঁশ দিয়ে ঘেরা আসরের মাঝখানটিতে। তোতার মাথায় সাদা পালকের ঝুঁটি, ম্যোর অর্থাৎ ময়ূরের পেখম আঁটা আরেকজনের বুকে পিঠে। হঠাৎ দেখলে ভয় পাবার মত চেহারা হয়েছে দু'জনেরই। দু'জনেই সুর করে গান শুরু করেছে। মূল

গায়েন যতক্ষণ না এসে পৌঁছয় দলবল নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখার দায়িত্ব এদের।

তোতা আর ম্যোরকে আসতে দেখেই আনন্দে হৈ হৈ করে দাঁড়িয়ে উঠেছে কুলিকামিন কোড়াকুড়ির দল।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা আসরের চারপাশে উবু হয়ে বসা নোংরা জনতার ভিড় যে কতদূর অবধি ছড়িয়ে গেছে ঠাহর হয় না। আর জনতাকে ঘিরে এক সারি ফার্নেসের মত বড় বড় আগুনের কুণ্ড। কারানপুরার খাদানে কয়লা থাকতে শীতে কাঁপবে কেন লোকগুলো, ফার্নহোয়াইট তাই পঁচিশ বাকেট কাঁচা কয়লা স্যাঙশন করেছেন। অগ্নিকুণ্ডের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে সেগুলো, আসরকে চারপাশ থেকে মালার মত ঘিরে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী তো নয়, যেন সিন্ধবাদের কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়ি থেকে ফুলে ফুলে উঠছে এক একটা দৈত্য।

দেহাতীদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বসে দেখছিলেন ফার্নহোয়াইট, ডিক্‌সন, সাঠে, ঠিকাদারের দল আর সাহানা। শেষ জনের ইঙ্গিতেই কে যেন সাম্‌নের টুলে দু'বোতল হুইস্কি আর আনুষঙ্গিক রেখে গেল।

ফার্নহোয়াইটের কিন্তু সেদিকে চোখ ছিলো না। দোষও দেওয়া যায় না। কাছে-পিঠে রূপমতীর মত মেয়ে শরীর কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে কি অন্যদিকে চোখ যায়!

সান্তালদের ভিড়ে এমন মেয়ে? আশ্চর্য হয়েই তাকিয়েছিলেন ফার্নহোয়াইট। আর তা লক্ষ্য করেই ঠিকাদার সিং ফিসফিস করে বললেন, রূপমতী! আমাদের তিন নম্বর খাদে কাজ করে মেয়েটা।

রূপমতী। ফার্নহোয়াইটের বাউণ্ডুলে ছেলেটা যার পিছনে ছায়ার মত ঘুরতে চায়।

খাদানে নেমে তার আজ মাটি-কাটারি প্লটে, কাল মাল-কাটারি-দের কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করা, মেয়েপুরুষ কারো চোখ এড়ায়নি।

কানাঘুষো ফিসফিস, চোখে হাসি, মুখে আঁচল-চাপা কৌতুক বোধ করেছে রেজামেয়ের দল। সবাই লক্ষ্য করেছে কার খোঁজে জল-কাদা ডিঙিয়ে কালো কয়লার অন্ধকূপে নেমে আসে ম্যাকু। লক্ষ্য করে দেখেছে, রূপমতী যখন মাল-বোঝাই ঝুড়িতে ঝাঁকানি দিয়ে সেটা মাথায় তুলে ফিরে দাঁড়ায় আর চোখোচোখি হয় ম্যাকুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ যেন তৃপ্তির ঝর্ণা নামে বাউণ্ডুলে সাহেবটার মুখেচোখে। আর রূপমতীও বোধ হয় ছোক্‌রা সাহেবের এই নির্লজ্জ পাগলামি দেখে ফিক্‌ করে হেসে ফেলেই মুখ গম্ভীর করে।

কিন্তু দিনের পর দিন এমনি একভাবে আসা, দেখা হওয়া, হাসি, কৌতুক……কেমন যেন নেশা ধরে যায় রূপমতীর। ঝুড়িটা উল্টে নিয়ে তার ওপর বসে পা ছড়িয়ে একদিন লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে গল্প না করতে পেলেও বোধ হয় মন খারাপ হয় না রূপমতীর। মন খারাপ হয় দৈনন্দিন নেশা না মিটলে।

এদিকে কানাঘুষো হাসাহাসি থেকে ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বেশ টের পাচ্ছিলো রূপমতী। পট্টির বুড়াবুড়িরাও বলা-কওয়া শুরু করেছিলো।

লালোয়া কুড়ুখও বেজাত, কিল্লির মিল নেই। তবু তাকে নিয়ে রটনার মৌমাছি বেশী গুনগুন করে না। যত আপত্তি ম্যাকুসাহেবের বেলা।

সাহেব। ও হলো আমাদের শত্রুর জাত। চান্দো বোঙা পাপের জল ছিটিয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ধরম নাই ওদের, তাই সান্তালদেরও ধরম নষ্ট করতে এসেছে ওরা। চান্দো বোঙার কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খিস্টেন করে দেয় ওরা। যেমন করেছে ঐ মরিয়ম, সেবাস্তিনা, মেরিয়া, রোজিকে।

তাই রূপমতীকেও সাবধান করে দিয়েছিলো পট্টির সর্দারনী। মুণ্ডা গিতিওড়ার মেয়েদের, ওঁরাও ধুমকুড়িয়ার কুমারী মেয়ের দলকেও।

সান্তাল পাড়ার ছিমছাম মেয়ে সোনা মিরু কানে কানে রূপমতীকে বলেছিলো, বুড়োরা নজর রাখছেন তুয়ার পানে।

সোনা মিরুর এই সাবধান-বাণী শুনেই ভয় পেয়ে গেল রূপমতী। বুড়োরা নজর রাখছেন! কেন, তা রূপমতী ভালো করেই জানে।

বিটলা!

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো বছর খানেক আগের একটি দৃশ্য।

বিটলা হওয়ার পর তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে দেখেছে ও সেবাস্তিনার মাকে। পঞ্চায়েতের ভয়ে ওঁরাও মুণ্ডারাও কথা বলতো না, এক পয়সার তেল কি নুন কিনতে পেতো না শনিচারীর হাটে। অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নোংরা অঙ্গভঙ্গী করে তাকে পাগল করে তুলতো বারো বছরের বাচ্চাগুলোও। আর—

ভাবতেও শিউরে ওঠে রূপমতী।

জোয়ান বুড়ো সবাই ধরম অধরম ভুলে হল্লা বাধাতো তার ডেরায়, রাতে বিরেতে।

লাজশরমের বালাই ছিলো না লোকগুলোর।

তাই কারও দিকে চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে গিয়েছিলো রূপমতী।

এক শুধু চুপচাপ দেখাশোনা লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। দু'কুড়ি টাকা জমলেই চলে যাবে কুমাণ্ডির খাদানে। দু'জনে বাসা বাঁধবে সেখানে। বিটলার ভয়ে কাঁপতে হবে না।

তাই সন্ধ্যে পার না হতেই পট্টির পথ ধরতো ও, সাহস হতো না আগের মত ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে রয়ে বসে রসিকতা করতে। মান্‌কির হুকুম না নিয়ে যেতো না আড্ডায়, আখড়ায়। কিন্তু ভিখারিয়ার ডুগডুগি উপেক্ষা করতে পারলো না ও। এসে হাজির হলো এই রামলীলার মাঠে।

ভিড় থেকে উঠে এসে সটান গিয়ে দাঁড়ালো ও মিঠাপানির দোকানটার সাম্‌নে। লাল নীল নানা রঙের বোতলে সস্তা লেমনেড

আর চা বিস্কুট নিয়ে রীতিমত একটা দোকান বসে গেছে। আর কী আশ্চর্য, এই শীতেও যতো চাহিদা ঐ দুর্লভ মিঠাপানির।

রূপমতী খাটো শাড়ির আঁচলে বাঁধা খুচরো পয়সা গুনতে গুনতে তাকালো এদিক ওদিক। অর্থাৎ পিয়াস গলায় নয়, মনের। খুঁজছিলো লালোয়া কুড়ুখকে। ছুকেরী পাল্লার কাজ সেরে সটান এখানে চলে আসবার কথা তার।

আসবে ঠিকই, জানে রূপমতী। ভিখারিয়ার নাচ আর রূপমতীর নাম—ছু-ছুটো হাতছানি উপেক্ষা করার মতো ছাতির জোর লালোয়ার মত বাইশ বছরের সাওতার অন্তত নেই। তবু একটু অধীর না হয়ে পারে না ও। সাঁঝের আওয়াজ শোনা যায়নি এখনো। ভয় সেটুকুই। কাজ শেষ করে হাতের শাবল নামিয়ে রেখে লালোয়াটা খাদানে বসেই গল্প শুরু করে দেয় কোনো কোনোদিন, ডিনামাইটের সাবধানী ঘণ্টিটাও শুনতে পায় না। এমন এক ব্লাস্টিংয়ের সময়েই কয়লার সীম চাপা পড়ে মারা গেছে রূপমতীর আঠারো বছরের জোয়ান ভাই হরবন্‌শী।

এদিক ওদিক খুঁজে আবার গিয়ে আসরে বসলো রূপমতী। টের পেলো না ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে কোথায় লালোয়া কুড়ুখ এক মনে তোতা আর ম্যোরের গান শুনছে। ভিড়ের গলায় গলা মিলিয়ে হো হো করে হেসে উঠছে থেকে থেকে।

ভিখারিয়া জমে উঠলো এদিকে। সন্ধ্যা নামলো। ঘন হলো অন্ধকার। আর মূল গায়েন থেকে সবাই এসে একে একে দেখা দিয়ে গেলো।

এদিকে রূপমতী, ওদিকে লালোয়া—নাটুয়াদের মুখে অপরের কুৎসা শুনে দু'জনেই হাসাইলো হো হো করে। কিন্তু কে জানতো সে.গানের ধুয়ো ঘুরে ঘুরে রূপমতীতে এসে ঠেকবে।

"বাঁশরিয়ার রূপমতী, মোতির মতো তার রূপ। ঝিনুকের ভেতর

যেমন আড়াল থাকে মোতিয়া, তেমনি চুপচাপ মন রূপমতীর। গরিবে কুড়িয়ে পায়, তারপর হাতে হাতে ঘুরে রাজার আঙুলে গিয়ে শোভা পায় সে মোতিয়া। মন-চুপচাপ রূপমতী হাতে হাতেই ঘুরছে এখন, কিন্তু মন জানে ওর রাজার হদিস।"

এত কাব্য করে বলবার লোক তো নয় ভিখারিয়ার নাটুয়ারা। তাই গানটা কেমন যেন অসহ্য লাগলো লালোয়ার। অপেক্ষা করলো কেউ জবাব দেয় কিনা শোনবার জন্যে। কিন্তু সবাই শুধু হো হো করে হাসলো। এমন কি রূপমতী নিজেও। আর রাগ সাম্‌লাতে না পেরে হাতের কাছে একটা কয়লার চাওড় পেয়ে সেটাই ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলো লালোয়া, গায়েনকে লক্ষ্য করে।

হৈ হৈ হট্টগোল। আসর সুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে উঠলো উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায়। একদল লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করলো গায়েনের দিকে। আরেক দল তাড়া করে এলো লালোয়া কুড়ুখকে।

ফার্নহোয়াইট, ডিক্‌সন, সাঠে আর সাহানার নেশা জমে উঠেছে তখন। কার হাত থেকে যেন গেলাসটা ছিট্‌কে পড়লো ঝনঝন শব্দ ক'রে। রঙিন চোখ চেয়ে ব্যাপারটা ঠাহর করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো সাঠে। টলতে টলতে দু'কদম এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, ক্যা হুয়া? চিল্লাতা কাহে?

কেউ হয়তো শুনলো না তার কথা। উত্তর দিলো না কেউ।

রূপমতীও ভয়-কাঁপা চোখে তাকিয়ে দেখছিলো। কী করবে, কী করা উচিত কিছুই যেন ঠিক করতে পারলো না প্রথমটা। তারপর চোখজোড়া লালোয়ার মুখের উপর পড়তেই ভিড়ের দিকে ছুটে যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও।

আর পরমুহূর্তেই থেমে পড়তে হলো।

কাঁধের ওপর ভারী হাতের অনুভব পেয়েই ফিরে তাকালো রূপমতী।

ফ্যার্নহোয়াইটের ছেলে ম্যাকুসাহেব বললে, যাও মাৎ।

বলে রূপমতীর হাত ধরে ডাক দিলো, চলো ডেরামে ভাগো, চলো রূপমটি।

এক ঝট্‌কায় হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো রূপমতী, পারলো না। অসহায় চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুসাহেবের মুখের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিড়টা যেন রূপমতীর দিকে ভেঙে পড়লো। লালোয়া কুড়ুখের ওপর যত রাগ, সব এসে পড়লো রূপমতীর ওপর।

পাপ যদি না করেছে তো রূপমতীর নামে ছড়া বাঁধবে কেন ভিখারিয়ারা, কুইলার চাণ্ডড় ছুঁড়বে কেন লালোয়া কুড়ুখ। ও হলো সান্তাল, সাথাসাথী কিসের এত লালোয়ার সঙ্গে। আসরটা ভাঙে দিবার তরেই তৈরী ছিলো কুড়ীটো। বলাবলি করলো সকলে।

বলে রূপমতীর দিকে ছুটে এলো দলটা।

পাশ থেকে মরিয়ম ফিসফিস করে বললে, পালায় যা, তু পালায় যা রূপমতী।

আর ম্যাকু বললে, আও, চলে আও রূপমটি! বলেই ওর হাত ধরে টানতে টানতে অগ্নিকুণ্ড ছাড়িয়ে অন্ধকারে নেমে পড়লো।

নির্জন ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে এসেই পা থেমে পড়লো রূপমতীর। অস্ফুটে বললে, লালোয়া, লালোয়ার কি হবেক সাহেব? পরমুহূর্তেই ম্যাকুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, আমি আছি ইখানে, লালোয়াকে তু বাঁচারে সাহেব। কান্না এলো যেন ওর গলা ঠেলে।

—ডরো মাৎ।

রূপমতীর পিঠে ভারী হাতখানা রেখে সান্ত্বনা দিলো ম্যাকু।

আর এই সময়েই বাতাস চিরে একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো।

থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো রূপমতী। ম্যাকুসাহেবের চওড়া বুক টের পেলো ঝড়ো পায়রার ছটফটানি।

আশ্লেষ শিথিল করে ম্যাকু বললে, যাও ডেরামে যাও, রূপমটি। লালোয়া বাঁচেগা। বলেই আসরের দিকে ছুটতে শুরু করলো সে।

বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ডেরার দিকেই পা বাড়ালো রূপমতী।

লালোয়া বাঁচলো, কিন্তু ভিখারিয়াদের টাঙির ঘায়ে জখম হলো তার একখানা হাত। আর জখম হলো সান্তালপট্টির মান-ইজ্জত।

রূপ-ঝরানো ফুর্তি নিয়ে হাসি হাসি মুখে হেলেদুলে বেড়াতো রূপমতী। ফার্নহোয়াইট বা ডিক্‌সন হঠাৎ যদি বা কখনো খাদে নেমেছে কয়লার সীম পরীক্ষা করতে, কিংবা ওভারবার্ডেনের স্তূপ ডিঙিয়ে দেখতে গেছে ঠিকাদারের 'সাক্ষী'র নাপী ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা তো মাথার ঝুড়ি ফেলে বড়ো বড়ো চোখের কৌতুক আর কৌতূহল মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে রূপমতী, সাহেবের মুখপানে চোখ এঁটে। শনিচারীর হাটে হুড়ু কিনতে গিয়ে ফিরেছে রঙিন কাচের জলচুড়ি নয়তো গলায় পুঁতিআঁটা হাঁসুলি পরে। কেউ সন্দেহ করেনি, দোষ দেখেনি কেউ। খাদানের রেজা, কদমে কদমে তার চোখ রাখলে চলে না। মন জুগিয়ে চললে তবেই ঘবে চালের জোগান আসে, সে খবর সবাই জানে। তা বলে এমন বে-আব্রু হয়ে ইজ্জত হারানো?

ভিখারিয়ার গায়েন কিনা ছড়া বাঁধলো রূপমতীর নামে? সান্তালপট্টির মান রইলো কোথায় তা হলে?

বুড়ো চুন্দু হাঁসদা পঞ্চায়েত ডাকলো। ডাকলো রূপমতীর বাপ মাধো সোরেনকে।

আর সে খবর দিয়ে গেল রূপমতীর সই সোনা মিরু।

বললে, পঞ্চায়েত ডাকছে বুড়া চুন্দু।

—কানে? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো রূপমতী।

সোনা মিরু হেসে বললে, ভিখারিয়ার রাতে ম্যাকুসাহেবের সাথে পাপ কএরছিস স্মরণ নেই তুয়ার ?

—হঁ। হাসলো রূপমতী। বললে, পঞ্চায়েত বসুক গিয়া। কাল চুন্দু বুড়ার ঘাড়ে বাকৃটো ফেলায় দিব, হঁ।

কিন্তু ঘাড়ে বাকেট ফেলে দিয়ে চুন্দু বুড়োকে মেরে কী হবে, তুর্নাম রুখবে কে ?

সারনাতলায় পঞ্চায়েত বসলো, আর পঞ্চায়েতের লোক এক কথায় বিচার দিলো। —বিটলা।

বিচার শুনে মাধো সোরেন ফিরলো মাঝরাতে। মেয়েকে ডেকে কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, রূপমতী।

-কি আপুং ?

মাধোর চোখি সজল হলো।—পঞ্চায়েত বিটলার বিচার দেছে রূপমতী !

--বিটলা ? হতাশ চোখ মেলে প্রশ্ন করলো রূপমতী।

—বিটলা ? চমকে উঠলো ম্যাকুসাহেব খবরটা শুনে।

খাদানের কাজ সেরে ফেরবার সময় ম্যাকুকে খবরটা জানাতে গিয়েছিলো সোনা মিরু।

সোনা মিরু চোখ মুছে বললে, সায়েব, তুই পাপ কএরছিস, তু ইবার বাঁচা উয়ারে।

কিন্তু বাঁচাতে বললেই তো বাঁচানো যায় না।

তুটো টান দিয়েই সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো ম্যাকু। জেলেকনাইটের কাঠের বাক্সটা টেনে নিয়ে বসলো তার ওপর। আর টিপলারে যেখানে কয়লার স্তূপ জমছে বাকেট উল্টে উল্টে, সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো, কি করা উচিত।

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ম্যাকু। ধীরে ধীরে নিজেরই অজান্তে কখন পট্টির দিকে পা বাড়ালো। শুধু

হুকুমই নয়, পাঁচ গাঁয়ের মানকি তখন পঞ্চায়েতের বিচার দিয়ে দিয়েছে।

ভিখারিয়ার গানই নয়, হৈ হল্লার সুযোগ নিয়ে রূপমতী ম্যাকু-সাহেবের সঙ্গে আঁধারে গা ঢাকা দিয়েছিল কেন তা নাকি কারো বুঝতে বাকি নেই।

অতএব, বিটলা।

বিচার শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো রূপমতী। যে লোক-গুলো এত ধরম অধরমের কথা বলছে, ও জানে এরাই এসে ইজ্জত কাড়বে ওর। ক্ষিদের যন্ত্রণায় কিংবা রোগে ভুগে ভুগে যখন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে ও, তখনও দয়া মায়া দেখাবে না কেউ।

বিটলা! বিচার দিলো বড়ো পঞ্চায়েত। আর সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ের ছেলে ছোকরারা দলে দলে বাঁশি আর মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘিরে ফেললো রূপমতীকে। আর তার পিছনে পিছনে আরেক দল এলো তীর ধনুক উঁচিয়ে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ হাসাহাসি। আব অশ্লীল গান। কেউ তীরের খোঁচা দিলো, কেউ টানলো তার শাড়ির আঁচল।

আর মাঝে মাঝে হৈ হৈ চিৎকার।

বাচ্চা ছেলেগুলোও ছড়া কাটতে শুরু করলো। দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা রূপমতীব ওপর।

এদিকে বাঁশ পোঁতা হলো রূপমতীর ডেরার সামনে। পোড়া কাঠ, পুরোনো ঝাঁটা, আর ভাত খাওয়ার পর ফেলে দেয়া শালপাতা বেঁধে দেয়া হলো বাঁশের ডগায়। কেউ উনোন ভাঙলো, কেউ হাঁড়ি কড়াই টুকরো টুকরো করলো।

কিন্তু তারপর, তারপর পাড়ার মেয়েরা পালালো সেখান থেকে। যে যার ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিলো, লজ্জাশরমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

প্রায় উলঙ্গ লোকগুলোর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে কিন্তু স্থির থাকতে পারলে না ম্যাকু।

গাছটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, বীস্ট্স্।

যাকে সামনে পেলো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো। তারপর শাড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো রূপমতীর গায়ে।

ম্যাকু সাহেবকে দেখে ভয়ে থেমে পড়লো সবাই।

গায়ে কাপড়টা কোন রকমে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালো রূপমতী। কপাল থেকে ঝর ঝর রক্ত পড়ছে তখন। সারা গায়ে কাদা।

ম্যাকু এগিয়ে এসে শক্ত করে ধরলো রূপমতীর একখানা হাত। তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো বাংলোয়।

ফার্নহোয়াইট বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিস্ময়ে কপালে ভ্রূ তুলে তাকালেন। অর্থাৎ কি ব্যাপার ?

বাউণ্ডুলে ম্যাকু এক মুখ হেসে বললে, মাই লেডী লাভ, মাই ওয়াইফ।

তারপর বললো সব ঘটনাটা।

শুনে হাসলেন ফার্নহোয়াইট।—এ প্রাইজ ইণ্ডিড, এ প্রাইজ ফর ইওর শিভাল্‌রি। বলে সামনের টুল থেকে হুইস্কির গেলাসে আরেকটা চুমুক দিলেন।

কথাগুলো শুনলো রূপমতী, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কৃতজ্ঞতার চোখ মেলে ও শুধু তাকালো ম্যাকুর দিকে, অপমান আর নির্যাতনের থেকে যে ওকে বাঁচিয়েছে।

রাতটাও কাটলো ফার্নহোয়াইটের বাংলোতেই, যে বাংলোর কোণের ঘরে ওঁরাওদের খৃস্টানী মেয়ে মেরিয়ার রাত কাটতো।

রূপমতীর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো মেরিয়া।—সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর ওপর, ডর নাইরে রূপমতী।

ডর নাই? যত ভয়ডর তো সেইজন্তেই। খাদানের কাজের ফাঁকে হাসি দিল্লাগী এক জিনিস আর তার বাংলোয় রাত কাটানো অন্য।

পীরিত ওর লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে। ঠিগিয়া হবে দু'কুড়ি টাকা জমলেই। তা নয়, ম্যাকুসাহেব হাসতে হাসতে এসে বলে কিনা রূপমতীকে সাদী করবে ও।

বেজাত খিস্টানের সঙ্গে সাদী? লালোয়াকে মুছে ফেলে ম্যাকুসাহেবের সঙ্গে মিতালী পাতাতে হবে?

মেরিয়া বোঝালো রূপমতীকে।—ম্যাকুসাহেবের বাপটা আমারে সুখে রাখছেরে রূপমতী, বেটাও সুখে রাখবেন তুয়ারে। বলছে বিয়া করবে বটে।

শুনে ভয়ে কাঁপলো রূপমতী।

শিকল ছিঁড়ে পালালো ফার্নহোয়াইটের বাংলো থেকে।

হোক্ বিটলা। পট্টিই ভালো ওর। তবু তো লালোয়া কুড়ুখের সঙ্গে দেখা করতে পাবে লুকিয়ে।

আর, আর বুড়ো বাপ মাধো সোরেন। তাকে ফেলে কিনা সুখের ঘর বাঁধবে রূপমতী?

অন্ধকারে শরীর লুকিয়ে ফিরে গেলো রূপমতী। পা টিপে টিপে ঝাঁপি সরালো, ঢুকলো ভেতরে।

মাধো সোরেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন কাশছে খুক খুক করে। আর জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছে থেকে থেকে।

রূপমতী ডাকলো ধীরে ধীরে।—আপুং।

—রূপমতী? চোখ খুললো মাধো।

রূপমতী এগিয়ে এলো কাছে, বাপের নির্বিকার মুখটার দিকে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ও। দেখলো মাধো সোরেনের দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আশঙ্কায় আগ্রহে প্রশ্ন করলো, আহার পাইছোন না আপুং?

মাধো বিষণ্ণ হাসি হেসে মাথা নাড়লো।

তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলে গেলো মাধো। বিটলা হয়েছে রূপমতী। তাই মাধোর ঘুন্সিতে কড়ি থাকলেও দাম নাই তার। হাটের লোককেও জানিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত। ছুড়ু বেচবে না কেউ ওকে, সিম-সিমারি কিনবে না।

—পট্টির সকল ডাইনী বুলছে তুয়ারে। ডাইনীর বাপে ভুখা মরতে হবেক।

—সোনা মিরু? আশায় আশায় প্রশ্ন করলো রূপমতী।

হাসলো মাধো।—ধূমকুড়িয়ার মায়া বটে সোনা, পঞ্চায়েতের ডর নাই উয়ার?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রূপমতী। পঞ্চায়েতের ভয়ে সাহায্য তো দূরের কথা, দেখা হলে কথাও বলবে না কেউ, জিনিস বেচবে না দোকানী। শুধু বিদ্রূপ আর অত্যাচার। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে।

সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখেছে রূপমতী।

তবু আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করলো। হয়তো লালোয়া কুড়ুখ আসবে, সব বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবে।

কিন্তু লালোয়ার দেখা মিললো না। পঞ্চায়েতের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে আসতে সাহস পেলো না হয়তো।

শুধু সোনা মিরু একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে এসে খাবার রেখে গেলো। আর চাপা গলায় বলে গেলো, ইখান থাকে পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা। উয়ারা দল বাইন্ধা হামলা করবে তুয়ার পরে, আমি শুনছি।

ভয় চাপা গলায় বললে সোনা মিরু, ভয় বাড়িয়ে দিলো রূপমতীর।

কিন্তু কি করবে রূপমতী? কি করতে পারে।

সারা রাত বসে বসে ভাবলো ও। তবু বুড়ো বাপ মাধো সোরেনকে ফেলে যেতে মন চাইলো না।

পরের দিন সোনা মিরুর কথাই ফললো। রাত না বাড়তেই রূপমতী হৈ হল্লা শুনতে পেলো। দল বেঁধে আসছে সবাই। ঝাঁপির ফাঁকে চোখ রেখে দেখলো রূপমতী। কুৎসিত উত্তেজনার হাসি চমকে উঠছে তাদের মুখে চোখে।

আর বুড়ো মাধো সোরেন নিঃশ্বাস চেপে ভয়ে ভয়ে বললো, পালায় যা রূপমতী, তু পালায় যা।

পিছনের ঝাঁপি খুলে পালালো রূপমতী। বুড়ো বাপের দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ছুটে পালালো অন্ধকারে।

ম্যাকুসাহেবের বাংলোর পথ ধরে।

ম্যাকুসাহেব ওকে বিয়া করবে বলেছে, ম্যাকুসাহেব ওকে আশ্রয় দেবে।

ওরাঁওদের খিস্টানী মেয়ে মেরিয়া বলেছে, সাহেবের বেটার নজর পড়ছে তুর ওপর, ডর নাই-রে, সুখ্যে রাখবেন।

সব কানাকানি খেউর হল্লা চুপ হয়ে গেলো।

পঞ্চায়েত বললে, মানকির বিচার মিছা হয় না। পাপ কএরছিলো রূপমতী, আখন পাপীর ঘরে ঠাঁই পায়েছে।

কোলিয়ারির কুলিকামিনরা বললে, বিটলাটো ঠিকই হইছে, কিন্তুক ডাইনী ইবার হামাদের মজুরী কাটবেক। বুড়া সাহেবের বেটার ঘরণী হইছে উও।

ম্যাকুসাহেবের ঘরণী হয়েছে রূপমতী, খবরটা শুনলো উঁচুতলার লোকরাও।

ডিক্সন সিগারেটের টুকরোটা জুতোয় মাড়িয়ে বললে, ন্যুইসেন্স। একটা সান্তাল গার্লকে কিনা বাংলোয় নিয়ে গিয়ে তুলতে দিলো ফার্নহোয়াইট?

মিশিরজী আর সাহানা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলো। অর্থাৎ বুড়ো নিজেই বা কম কি! মেরিয়া?

কম্পাসবাবু চোখ কুঁচকে কি যেন ইঙ্গিত করলেন।

আর সোনা মিরু এসে বসলো লালোয়া কুড়ুখের ক্লান্ত গাঁইতিটার পাশে। কোমরের গামছাটা খুলে পাখার মত নাড়তে নাড়তে বললে, জোয়ান মানুষটো সায়েবের ডরে লুকায় থাকবি?

দীর্ঘশ্বাস ফেললে লালোয়া। বললে, সমঝায়ে দেখ তুই, কুমাণ্ডির খাদানে কাম মিলবেক বটে, ধাওড়ায় ঘর মিলবেক। বিটলার ডর নাই।

সোনা মিরু বললে, হুঁ সমঝাবো রূপমতীরে। কিন্তুক তুয়ার তুইটো হাতে ঘর বাঁধবার হইল নাই, একটো হাতে কি ঘর বাঁধবার পারবিন? কাটা হাতটার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসলো লালোয়া।

কিন্তু রূপমতী বুঝলো না।—লালোয়া? শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ও। বললে, ওটা মরদ বটেক না ধূমকুড়িয়ার কুড়ী? বিটলার সুময় যাতে পারে নাই টাঙ্গি লিয়ে?

শুনে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো লালোয়া। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজেই গিয়ে হাজির হলো বাংলোর বাগানে।

ফার্নহোয়াইটের বাচ্চা মেয়েটার পেরাম্বুলেটর ঠেলছিলো রূপমতী।

প্রথমটা চিনতে পারে নাই, ভাবছিলো আয়াটাকেই জিজ্ঞেস করবে রূপমতীর খবর। কিন্তু বাঁক ঘুরে রূপমতী সামনাসামনি হতেই সারা মুখ ম্লান হয়ে গেলো লালোয়ার।

মাজা ঘষা রূপ, তকতকে ফর্সা একখানা শাড়ি, চুলে যত্নের চাকচিক্য।

লালোয়া বললে যা বলবার। অনুনয়, অনুযোগ।

আর রূপমতী শুধু অসম্মতির ঘাড় নাড়লো।

—ম্যাকুসাহেব কে তুয়ার, ও কি বিয়া করবে সান্তাল কুড়ীকে?

রূপমতী হাসলো। বললে, হঁ। গির্জায় যায়ে খিস্টান হবো, ম্যাকুসাহেব বলেছে উ আমার হাসবাঁধ বটে।

সত্যিই হলো তাই। শুনলো কোলিয়ারির সবাই। সুন্দরগড়ের সাদা-আলখাল্লা পাদ্রী সাহেব বাইকে চেপে এসে হাজির হলো একদিন, ছোট গির্জার অল্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কি বলে গেল কিছুই বুঝলো না রূপমতী। শুধু বুঝলো ওর নতুন নাম হলো রেবেকা। রূপমতী থেকে রেবেকা। সান্তাল থেকে খিস্টানী।

খুশিতে উছলে ওঠে রূপমতীর মন। পরের রবিবারেই ওদের বিয়া। তারপর? তারপর ওকে রেবেকা মেমসায়েব বলবে সকলে। খাদানের কুলিকামিনরা। আর পঞ্চায়েতের যারা বিটলার জন্যে চিৎকার করেছিল তারাই সেলাম জানাবে দেখা হলে।

এ যেন হারানো ইজ্জত ফিরে পাওয়া। লালোয়ার সঙ্গে ঠিগিয়া হলে কি এ সম্মান পেতো ও? সারা জীবন শুধু ভয়ে ভয়ে কাটাতে হতো। কে কি কানাঘুষা করে, কে কি বিচার দেয়।

ম্যাকুর কাছে কতবারই তো শুনেছে ও, বিয়ের পর ম্যাকু হবে ওর হেরেল, স্বামী। খিস্টানী ভাষায় যাকে বলে হাসবাঁধ। অর্থাৎ হাসব্যাণ্ড।

আমলকীর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁকে বাঁকা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রূপমতী সব ভুলে গেলো। ভাবলো, সুখের জীবন বুঝি মোড় নিলো এবার।

কিন্তু ভুল ভাবলো রূপমতী।

কোলিয়ারির চাকরি তো জুয়ার টাকা। আসতে যেতে সময় লাগে না। হিসেবের গলদ ধরা পড়লো, কোলকাতার আফিস জানালো ফার্নহোয়াইট বিদায় নিতে পারে চাকরি থেকে।

ফার্নহোয়াইট ছেলেকে ডেকে বললো, চাকরি যাক দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু টাকাগুলো ওড়ানোর জন্যে। তুমিও তো রোজগারের ধার দিয়ে গেলে না।

চুপ করে রইলো ম্যাকু!

ফার্নহোয়াইট বললে, তল্পিতল্পা বাঁধতে হবে এবার। ভাবছি, বাঙ্গালোরে গিয়ে থাকবো, আর যদি চাকরি একটা পেয়ে যাই ভালোই।

—আমি? প্রশ্ন করলো ম্যাকু।

হ্যাঁ, তোমার ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোন ডোরা এসে পৌঁছবে এই সপ্তাহেই। তার সঙ্গে আসছে পার্সিভালের মেয়ে সিলভিয়া।

—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক?

ফার্নহোয়াইট হাসলেন।—তার যোগ্য হতে পারো তো। পার্সিভাল নিশ্চয় একটা রেলের চাকরি তোমাকে দিতে পারবে।

—বিয়ে?

— কপালে চোখ তুলছো কেন? লাভ ইজ্‌ণ্ট সামথিং ইম্পসিব্‌ল্‌!

মৃদু হেসে ফার্নহোয়াইট বললেন, রেবেকার কথা ভাবছো? ওটা কি বিয়ে নাকি? রোজগারের টাকাগুলো নষ্ট করেছি বটে, কিন্তু তোমার পাগলামির জন্যে দু'পাঁচশো টাকা খেসারত দেবার সঙ্গতি এখনো আছে।

শুনে কি একটা দাঁতে চিবোনো কটূক্তি করে সরে পড়লো ম্যাকু।

কিন্তু দিনকয়েক পরেই যখন ডোরার সঙ্গে সিলভিয়াও এসে পৌঁছলো, ম্যাকুর হঠাৎ মনে হলো বাপের কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। আর ফার্নহোয়াইট রূপমতীকে ডেকে বললেন, চৌকিদারের ঘরটা খালি আছে, এ'কটা দিন এখানে থাকবে।

খুশী মনেই রাজী হলো রূপমতী। সত্যি তো। মেয়ে এসেছে,

এসেছে মেয়ের সাথী। ও থাকলে বেমানান হবে বড্ডো। আর অসুবিধেও হবে, হবে রূপমতীর নিজের।

সেই কথা বুঝিয়েই একদিন লরীতে মালপত্র তুললেন ফার্নহোয়াইট। ডোরা আর সিলভিয়া আগেই চলে গিয়েছিলো। তাই বিদায়-মুহূর্তে রূপমতীর কান্না-ঝরা চোখ মুছিয়ে দিলো ম্যাকু। বাপের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখও মুছলো হয়তো।

বললে ফিরে আসবো এক সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর নিয়ে যাবো আমার রেবেকাকে।

সজল চোখে আনন্দের হাসি দেখা দিলো রূপমতীর।

যাবার সময় এক গোছা নোট গুঁজে দিলো ম্যাকু রূপমতীর হাতে।

লরী ছেড়ে দিলো, পিছনে পিছনে ফার্নহোয়াইটের ছোট্ট মোটরখানাও।

কিন্তু ম্যাকু ফিরলো না আর।

ফার্নহোয়াইটের জায়গায় মাস কয়েক পরে এলেন মিস্টার পেরেরা। এসেই বাবুর্চিকে বললেন, চৌকিদারের ঘর থেকে সান্তাল মেয়েটাকে তাড়াও।

রাঙা টুকটুকে বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে চোখ রাঙালো রূপমতী। বললে, কে জানিস আমি? ম্যাকুসায়েব আমার হাসবাঁধ।

শুনে হাসলো বাবুর্চি, হাসলেন মিস্টার পেরেরা। মিশিরজী, সাহানা কম্পাসবাবু সবাই হাসলেন। আর ঠাট্টা বিদ্রূপের ছড়া বাঁধলো সান্তাল পট্টির মেয়েপুরুষ।

হাসবাঁধ। সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়েছে ম্যাকু, তা কি এখনো বোঝেনি নাকি মেয়েটা?

হাসলো সবাই, হাসলো না শুধু একজন।

লালোয়া কুড়ুখ।

গির্জার সামনের ঘরটায়, যেখানে বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠে আসতে হলো রূপমতীকে-সেখানেই ভীরু ভীরু চোখে উঁকি মারলো সে একদিন।

রূপমতীর চাটাইয়ের এক কোণে ভয়ে ভয়ে বসলো লালোয়া। বললে, চল রূপমতী, ইখান থেকে কুমাণ্ডীর খাদানে চলে যাই।

চোখ রাঙালো আবার রূপমতী। বললে, পাপের কথা সাস্তাল কুড়ীদের সাথে বলবি, আমি খিস্টানী বটি, পাপ করি না আমি। ম্যাকু সায়েব আমার হাসবাঁধ।

সোনা মিরুও এলো একদিন দেখা করতে।

বললে, খাবি কি রূপমতী? খাদানে কাম নিবি তো চল, মুনশিরে বলি।

—খাদানের কাম? চোখ কপালে তুললো রূপমতী। বললে, আমার না ম্যাকুসায়েবের সাথে বিয়া হইছে। ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত খতম্ করতে চাস তুরা?

—ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত? রাগে দাঁতে দাঁত চাপলো সোনা মিরু।—উ আর ফিরবে নাইরে, উ আর ফিরবে নাই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো রূপমতী।—ম্যাকুসায়েব মানুষটারে তুরা বুঝিস নাই বটে। ও আমারে কয়ে যাছে ফির‍্যা আসবে।

কিন্তু ফিরলোনা ম্যাকুসায়েব। আর ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে অনাহারে, অভাবে দারিদ্র্যে রূপ হারালো রূপমতী। দিনের পর দিন স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো তার।

লালোয়া কুড়ুখ এলো একদিন। বসে গল্প করলো অনেকক্ষণ, তারপর অনুরোধ জানালো কুমাণ্ডির খাদানে যাবার।

আর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলো রূপমতী।

কিন্তু হাসি মুছে গেলো ক্রমশ তার মুখ থেকে।

সত্যিই ফিরলো না ম্যাকু।

তবু ম্যাকুর বাচ্চাকে মানুষ করে তোলবার স্বপ্ন দেখলো রূপমতী। এক-ইটের দেওয়াল দেয়া দেহাতী গির্জার পশ্চিমের ছোট্ট ঘরটায় চাটাইয়ে শুয়ে শুয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখলো।

ছেলে বড়ো হবে, খাদানের সাহেব হবে তার ছেলে। সোনা মিরু বলে কি না খাদানে কাজ নিতে। নিজের মনেই হাসলো রূপমতী। সে হলো ম্যাকু সাঁহেবের মেম, ইজ্জত নাই তার?

সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাত্রী বাইক ঠেলে ঠেলে আসতো প্রতি রবিবার। বাইব্‌ল্ পড়ার পর আর-আর খিস্টানীদের সঙ্গে রূপমতীও সুর টেনে টেনে গাইতো প্রার্থনার গান, তারপর ইশু বোঙার কাছে বলতো, ম্যাকু সাহেবেরে তাড়াতাড়ি পাঠায়ে দে ইশু বোঙা। পাত্রী যাবার সময় সান্ত্বনা জানিয়ে যেতো। কখনো বা ওঁরাও আর মুণ্ডা খিস্টানীদের কাজ থেকে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যেতো রূপমতীকে।

সোনা মিরুও আসতো মাঝে মাঝে। এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত এনে রাখতো তার পাশে। বসতো, গল্প করতো।

আর বাইরের রাস্তার গাড়ির শব্দ শুনলেই ছুটে আসতো রূপমতী। ঐ বুঝি ম্যাকুসাহেবের গাড়ি এলো। এক মুখ আশা-উজ্জ্বল হাসি নিয়ে ছুটে আসতো রাস্তা অবধি। তারপর মুখ কালো করে দীর্ঘশ্বাস বুকে পুষে ফিরে যেতো।

সোনা মিরুকে বলতো, ফিরবো রে ফিইরা আসবো। বেটার মুখ দেখবারে বাপ না ফিইরা পারবো কানে।

লালোয়াও এসেছে কোনো কোনোদিন। সোনা মিরুর সঙ্গে। আর ফেরার পথে ওরা বলাবলি করেছে, রূপমতীটো পাগল হইছে।

সোনা মিরুও এসে জানিয়েছে, কাজ না করলে না খেয়ে মারা যাবে রূপমতী। বলেছে, মুনশিকে বলে কাম ঠিক্ করে দেবে।

আর রূপমতী হেসেছে সে-কথা শুনে। ম্যাকুসায়েবের ওড়া গমকে অর্থাৎ ঘরণী কিনা খাদে গিয়ে নুড়ি বইবে? তাতে যে ম্যাকুসায়েবের ইজ্জত নষ্ট হবে।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটেছে। শেষে মৃত্যুও ঘনিয়ে এলো একদিন।

দুপুরের ছুটির সাইরেন বাজার পর এনামেলের থালায় করে ঠাণ্ডি ভাত নিয়ে এসে সোনা মিরু ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলো রূপমতীর বীভৎস চেহারা দেখে। এনামেলের থালাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে রূপমতীর বুকের কাছ থেকে তুলে নিলো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে। তারপর—

চাঁদা তুলে কবর দেয়া হলো রূপমতীর। সুন্দরগড়ের সাদা আলখাল্লার পাত্রী বাইক ঠেলে এলো আবার, বাইবল্ থেকে দু' লাইন বিড় বিড় করে বলে গেলো।

কবরের নিস্তব্ধতায় নামিয়ে দেয়া হলো রূপমতীর মৃতদেহ।

কবর নয়, মাটির ঢিবি। তার ওপর দু' টুকরো কাঠ আড়াআড়ি করে বেঁধে একটা ক্রুশ পুঁতে দেয়া হলো।

তারপর খ্রিস্টান পল্লীর সবাই ভুলে গেল রূপমতীর কথা।

ভুললো না শুধু একজন। লালোয়া কুড়ুখ।

কারানপুরার কুলিকামিন, কোড়া কুড়ীরা বলে, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এসে বসতো ও কবরের পাশে, ভয়ে ভয়ে হাত বোলাতো কবরের মাটির ওপর। চোখ থেকে জল ঝরে পড়ে সে-মাটি ভিজে যেতো কোনো কোনোদিন। তারপর একসময় মাটির প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে চলে যেতো লালোয়া।

খ্রিস্টান পল্লীর সান্তালরা বলে, লালোয়ার দেখাদেখি সোনা মিরুও এসে বসতো কবরের পাশে। রূপমতীর ঘুম ভেঙে যাবে এই

অয়ে একটাও কথা বলতো না সে। শুধু কোনো কোনোদিন প্রদীপটা এগিয়ে দিতো নিজেই, কিংবা লালোয়ার হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে চকমকি ঠুকে ঠুকে নিজেই জ্বালাতো সেটা।

সাস্তাল পট্টির বুড়হা বুড়হির দল বলে—শালপাতার আড়াল-দেওয়া প্রদীপের শিখাটা জ্বলতো তারার মত, দেখেছে তারা নিজের চোখে, প্রতিদিন দেখতে পেতো।

আর তা দেখে একে একে সান্তাল পল্লীর সবাই এসে বসতে শুরু করলো রূপমতীর কবরের পাশে।

এসে চুপচাপ বসে থাকা, তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিরে যাওয়া।

এ প্রদীপের শিখা সবাই দেখতে পেতো দূর থেকে।

ক্রমশ মুর্গী বলি শুরু হলো রূপমতীর কবরের পাশে, পৌষ পরবে নাচ শুরু হলো। ওরাও মুণ্ডা সান্তাল হো সবাই মিলে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিলো রূপমতীর কবর, আর সেই কবরের গায়ে নাম খোদাই করার সময় ঝগড়া বাধলো সাদা আর কালো খিস্টানদের মধ্যে। কালো চামড়ার খিস্টানরাই জিতলো শেষ অবধি। রূপমতী নয়, রেবেকা ফার্নহোয়াইট নয়, মাধো সোরেনের মেয়ে রেবেকা সোরেনের কবর।

বড়ো বড়ো হরফে পাথর খোদাই করে লেখা হলো রেবেকা সোরেনের নাম।

আজও কারানপুরার কোলিয়ারিতে রেবেকা সোরেনের কবর ঘিরে সারি সারি প্রদীপ জ্বলে। লালোয়া কুড়ুখের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবাই।

কিন্তু একটি নাম ডুবে গেছে বিস্মৃতির অতলে। নিভে গেছে শুধু একটি প্রদীপ। যে প্রদীপ শুধু লালোয়া কুড়ুখই জ্বালাতে পারতো। যে আলো জ্বলতো শুধু সোনা মিরুর বুকে।

তীর-ধনুক

তখন বাবুলডিহির দেহেই শুধু শহুরে ছাপ ছিলো, মনটা ছিলো গেঁয়ো। ইস্কুল লাইব্রেরী, ওমনিবাস ইলেক্ট্রিসিটি। ছিলো না কী! সিনেমা হাউস থেকে সিমেট্রি অবধি সব কিছুই ধোপদুরস্ত, ঝকঝকে। বিরাট কারখানা। বড় বড় দোকানে সাজানো শো'কেসের প্রলুব্ধি, ফিরিঙ্গি মেমের প্ররোচনা। ছিলো সব, ছিলো না জীবন। থামা ইঞ্জিনের মতো হুইসল দিতো, ধোঁয়া ছাড়তো, কিন্তু এক পা এগিয়ে যাবার সামর্থ্য ছিলো না শহরটার।

শান্তনু ফিরে এসে দেখলে নতুন নগর বাবুলডিহি জেগে উঠেছে, জমে উঠেছে। নেশা ঘুচেছে, এসেছে উন্মাদনা। বাঁচতে শিখেছে মানুষগুলো।

স্টেশন থেকে বাইরে যাবার আণ্ডারওয়ের সুড়ঙ্গপথে সেই মিহি আলোর কণিকা নিভে গেছে, এসেছে ফ্লোরেসেন্টের রোশনাই। কারখানার সেই আকাশছোঁয়া চিম্‌নির ভোঁ-এ ভাটা পড়েছে, ককিয়ে কাঁদে এখন সাইরেন। খরচ কম, বাজন জোর। লুডোর ছকের মত বাঁধা রাস্তা। পাথর আর পিচের চওড়া মেটাল রোড। একটা অতিকায় কুমির যেন রোদ নয়, ছায়া পোয়াচ্ছে। দু'পাশে হিজল আর হরিতকীর গাছ। দেওদার আর আমলকী। এখানে ওখানে ঘাসের জাজিমে আধো শুকনো মুচকুন্দের হলুদ-রঙ পাপড়ি। দুপুরের রোদের ছায়া-ছায়া বাতাসে ভাসে মিঠে সৌরভের স্নিগ্ধতা। সারিবাঁধা বাংলোর বাগানে পাম আর পাতাবাহার দুলছে ঈষৎ

হাওয়ায়। পেরাম্বুলেটারে কুকুরের বাচ্চাটাকে বসিয়ে হাসাহাসি খেলা করছে কয়েকটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়ে।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা সাইকেল-রিক্‌শা এগিয়ে আসছে। কালো শাড়ি, রুপালী জরির পাড়, ফর্সা মুখ। চেনা গেলো না তবু। মালগাড়ির শান্টিংয়ের আওয়াজ শুনে ওদিকে তাকালো শান্তনু। শেডের ওপাশে আরেকটা ইয়ার্ড বেড়েছে।

শান্তদা!

চমকে ফিরে তাকালে শান্তনু।

অনুপমার মুখে হাসি উছলে উঠলো।—কখন এলে শান্তদা? এই তো আজই দুপুরে, গিয়েছিলাম তোমাদের বাসায়।

হাজার হোক্, এটা তোমার জন্মস্থান, মানুষ হয়েছো এখানে। মাঝে মাঝে কি আসতে নেই? উঃ ভাগ্যিস মাসিমারা বদলি হয়ে এলেন আবার, তা না হলে তো তোমার সঙ্গে দেখাই হতো না আর এ জন্মে। কেমন আছো? কথা বলছো না যে?

প্রথমটা একটু কথা খুঁজতে কষ্ট হচ্ছিলো শান্তনুর। চিনতে তো পারে নি চট্ করে। নেহাত সমিতা বলেছিলো বলেই বুঝতে পারলো। অনুপমা। এই সেই অনুপমা? কিন্তু ঠিক যেমনটি আশা করেছিলো তেমন তো নয়।

—কী, কথা বলছো না যে!

শান্তনু হেসে বললে, কথা বলার সুযোগ দিলে কৈ? নিজেই তো অনর্গল বলে গেলে কি সব, বুঝতেই পারলাম না আদ্ধেক।

অনুপমা হেসে উঠলো খিল খিল করে।—চিনতেই পারোনি তাই বলো। আর নয়তো ভুলে গেছো আমাদের।

—বোধ হয় চিনতেই পারিনি! কারণ, যাকে মনে পড়ছে সে কাউকে 'শান্তদা' বলবে, 'তুমি' বলবে বলে তো মনে হয় না।

অনুপমা এবার রিক্‌শা থেকে নামতে নামতে বললে, এই লক্ষ্মী

ছেলের মত কথা বেরুচ্ছে। সমি বলেছিলো বটে, শান্তদা একেবারে বদলে গেছে। তা এতো বদলে যাবে ভাবতে পারিনি। সত্যি, সেই বোকা বোকা ছেলেটি বড়ো হয়েছে, বুদ্ধিমান হয়েছে দেখেও 'দাদা' বলবো না, 'তুমি' বলবো না ?

অনুপমা আবার হেসে উঠলো সশব্দে।

দুপুরে যখন ফেন্সিংয়ের ফটকে নাম দেখতে দেখতে বাড়ি খুঁজছিলো ও, অনুপমাকে তখন দেখেছিলো, ওদের বাসা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দলবল নিয়ে। তখন চিনতে পারেনি। এখন যেন আরো অপরিচিত মনে হচ্ছে।

সমিতা খুশিতে চোখ নাচিয়ে বলেছিলো, আর দু'মিনিট আগে আসতে পারলে না শান্তদা !

—কেন রে ? মা হেসে প্রশ্ন করেছিলেন।

—বাঃ রে, অনুরা এসেছিলো যে !

—অনু ? একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল শান্তনু।

—ও মা, ভুলে গেছো ? অনু, অনু, অনুপমা।

—ও।

না, ভুলে যায়নি শান্তনু। ভুলে যেতে চায়। ছোট বয়সের অন্তরঙ্গ, ভুলবে কেন ! কিন্তু না, অনুপমার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো। কী করে দাঁড়াবে ও তার সামনে। চোখ তুলে কি তাকাতে পারবে। কথা ! কী কথা বলবে। দু'জনেই হয়তো নিরস দুটো খুচরো প্রশ্ন করবে। উত্তর শোনবার জন্যে নয়। ভদ্রতার খাতিরে। দু'জনেই হয়তো চুপচাপ বসে থাকবে কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে। তারপর সেই শুকনো গলায় বলবে, চলি। চলে যাবে সে ব্যথার ছাপ রেখে। এই তো জানা ছিলো শান্তনুর।

অনুপমার আর কী রূপই বা ও ভাবতে পারে।

রং-ঝলমল ফ্রক-পরা সেই বছর দশেকের ছোট্ট মুখখানি। ফর্সা ধবধবে গালে তিনটে নীলাভ শিরা ফুটে উঠেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে অভিমানে, বিরক্তিতে বঁড়শির মত বেঁকে গেছে নাকটা। মিনিটে মিনিটে ছুটছে পোশাক বদলাতে, প্রসাধন সারতে। রঙিন কাচের জলচুড়ি, চুলের রিবন—দিনে আটবার বদলানো চাই।

সেই অনুপমাকে ও নতুন পোশাকে দেখতে চায় না।

সমিতা বললে, তোমার আসবার কথা আছে আজ সে-কথা কিন্তু বলি নি আমি। অনু জানেও না।

ভালোই হয়েছে, শান্তনু ভাবলে। নিরাভরণ রূপ অনুপমার, একটা সাদা থান কাপড় ছাড়া ওর সারা দেহে থাকবে না কোন অলঙ্কার, মুখে আর ঠোঁটে থাকবে না সেই পুরোনো দিনের প্রসাধনের নেশা—এ যেন কল্পনা করতে পারে না শান্তনু।

আশ্চর্য। কে বলবে, অনুপমা বিধবা।

বিয়ের পর ফূর্তি আর ফুরসতে ভরা তিনটি মাস। রামধনু-চোখের ছোট অবকাশ। আরাম আর আনন্দে কেটে গেলো অবসরের বাসর। তারপর। তারপর হঠাৎ একদিন জ্যোৎস্না রাতের পাপড়ি গেলো খসে, অনেক অনেক তারার ফুল শুকিয়ে গেলো।

সে-সব দিনের কথা যেন অনুপমা ভুলে গেছে। বনবিহারীবাবুও যেন ভুলতে পারলে বাঁচেন। স্ত্রী রত্নমালাকে বলেন, একমাত্র সন্তান অনুপমা, ওকে মেয়ে না ভেবে ছেলেই ভাবো না। এক বৌ মারা গেলো কি আবার বিয়ে দিতে না ছেলের?

—অনুমা'র আবার বিয়ে দেবো আমি।

—কী যে বলো। রত্নমালা উত্তর দেন বটে, কিন্তু ঠিক প্রতিবাদের জোর পান না। সাহস নেই, এই যা। মনে মনে ভাবেন, উনি আরো শক্ত হয়ে বলেন না কেন। বললেই তো পারেন,

কে কি বললো না বললো, যায় আসে না। রত্নমালার আপত্তিটুকুও কেন ধমক দিয়ে চেপে দেন না। কৈ আরো পাঁচটা ব্যাপারে তো রত্নমালার কথা টেঁকে না। নিজের ইচ্ছেতেই চলেন।

তবু। নরম স্বরে বড়োজোর বলবেন বনবিহারীবাবু, এই বয়সে ও জীবনটা খুইয়ে বসে থাকবে, এই চাও?

কতো কিই তো বুঝতে পারেন বনবিহারীবাবু, বিয়ের পর থেকে আজ অবধি একটা কথাও কি গোপন রাখতে পেরেছেন রত্নমালা? মুখ ফুটে না বললে কি বুঝতে পারেন না?

রঞ্জন মারা গেলো। ঠিক বিয়ের তিন মাস পরেই। কান্না পেয়েছিলো অনুপমার। বুকের ভেতর একটা কাঁপা ব্যথা। ফাঁকা ফাঁকা। হঠাৎ যেন বাড়ি খালি হয়ে গেলো, মায়ামমতার শেষ রাতটা অবধি ফেলে রেখে। ফাঁকা নির্জন বাড়িতে একা নিকাজ রাত কাটাবার মতো দুঃসহ।

তারপর আবার ফিরে এলো অনুপমা। আয়নার সুমুখে। সাজলো সযত্নে। হাসলো প্রাণ খুলে। বললে কথা। কথা, কথা, কথা।

জীবনের কোথাও যেন বাঁক নেই। হাসি আর হাসি। ছেলেমানুষের মত তুচ্ছ কৌতুকে হেসে উঠবে সশব্দে। লাল রেশমের হিল্লোল ছড়িয়ে হেলে দুলে হাঁটবে। নয়নারাম ভঙ্গিমায় পটুনৃত্যের মুদ্রাময় আবেশে হাসিতে ঢলে ঢলে চলবে। ললিত কৌতুকলাস্যে। লাবণ্যের বন্যায়। খুশির জোয়ারে যেন ভেসে চলে। কথা। বিশ্রম্ভাতুর বিহঙ্গের মত কামনা-কাকলির স্রোত। মিষ্টিমধুর সুরেলা কণ্ঠস্বর। অনর্গল কথা বলে চলে, কথা, কথা। আর মনমাতানো গানের ফাঁকে সঙ্গতের তালের মত হাসি ছিটিয়ে দেয় কথার ফাঁকে। হঠাৎ গেয়ে ওঠে একটা গানের কলি নিজের মনেই। থমকে থমকে। হেসে ওঠে।

—তাকিয়ে দেখছো কী হাঁ করে?

হ্যাঁ, অনিমেষ চোখেই তাকিয়ে দেখতে হয়। দুরন্ত হাসি দিয়ে আঁকা ঠোঁট, চোখের কালো তারায় চকিত চাঞ্চল্য। সদা পাতা-বাহারের মত গালের ওপর নীল শিরার সম্মোহন। লাল রেশমী শাড়ি জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরা দেহ। ডানদিকের কাঁধে একটা কাম্মোর ছোপ। পিঠের সঙ্গে এঁটে আছে কালো মলমলের ব্লাউজটা। শ্বেতপাথরের মত সাদা ধবধবে ঘাড়ের কাছ থেকে পা অবধি ঢলে পড়েছে সোনালী জরির নকশা-কাটা আঁচল। আর পিঠ বেয়ে দুলছে সুপুষ্ট বেণীর লুব্ধতা।

—শান্তদাটা কী বল্‌তো সমি! অনুপমা হেসে উঠলো আবার।

সমিতাকে বললে, বলিস নি বুঝি কিছু? চলো, শান্তদা, হিজলির দিকে বেড়াতে যাবো। হাঁ করে রয়েছো যে, বুঝতে পারছো না। তুমি না এলেও যেতাম। অন্যদিন চাঁদমারি অবধি যাই, আজ তোমার মতো একটা বীরপুরুষ বডিগার্ড রয়েছে যখন, হিজলি অবধি যাবো। খিলখিল করে হেসে উঠলো আবার অনুপমা।

তারপর সমিতার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—হুঁ। কি ব্যাপাররে সমি, এতো সাজগোজ করেছিস যে! হিজলির নাম শুনেই? আবার হেসে উঠলো অনুপমা।—আজকাল তো ওখানে চাঁদমুখ ডেটিনিউরা নেই।

কী হচ্ছে! চোখের ধমক দিলো সমিতা। কিন্তু, ঐ অবধি।

অনুপমার যা খুশি তা বলবে, নিজের দিকে না তাকিয়েই। অথচ অনুপমাকে কিছু বলতে হলে ভেবেচিন্তে বলতে হবে। ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে কষ্ট হয়, আঘাত দেওয়া যায় না। অনুপমা নিজেই যে শুধু ভুলে আছে তা নয়, ওরাও ভুলে যাবার ভান করে। তবু হিরণ্ময়ী ভুলতে পারেন না, শান্তনু তাঁর ছেলে।

সমিতাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে যান।—কী হচ্ছে সমি?

ভয় পায় সমিতা।

শান্তর সঙ্গে তোদের এতো হৈ হৈ কিসের? রঙিন কাপড়চোপড় পরে বলেই কি কচি খুকি নাকি অনু? আর তোরা হাসিঠাট্টা আমোদ আহ্লাদ কর, মানে হয়। শান্তকে তার মধ্যে টেনে নিয়ে আসা কেন? হাজার হোক, অনু হিন্দু ঘরের বিধবা।

—বাঃ রে শান্তদার ছোটবেলার বন্ধু ও। ক্ষীণ প্রতিবাদ সমিতার।

ঝাঁঝালো গলায় উত্তর আসে।—ন্যাকামি করিস না সমি।

অভিমানের স্বরে সমিতা বলে, বেশ, অনুকে আসতে বারণ করে দেবো।

—তাই বলছি! কথাবার্তা বলবে না কেন, বলবে। সত্যি দোষ নেই মেয়েটার। এই বয়সেই কপাল পুড়েছে। যতটা ভুলে থাকতে পারে। তা বলে ওর ঐ আইবুড়ি মেয়ের মত চালচলন আমার ভালো লাগে না।

সমিতা বলে, মনে ওর কোন পাপ নেই বলেই সাজগোজ করতে পারে।

—আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে কে কথায় পারবে বাপু।

—শান্তদার তো পনেরো দিন কেটেই গেলো, আর তো সাতটা দিন। সাত দিনেই নষ্ট হবার মত ছেলে নয় তোমার শান্তদা।

তোর ঐ কাটা কাটা কথার জন্যেই তোর মা কাছে রাখতে চায় না, বুঝতে পারছি এখন।

সমি হেসে ওঠে।—ঠিক বলেছো। এবার তুমিও তাড়াতে চাইবে তো?

হিরণ্ময়ী না হেসে পারেন না। আর পরমুহূর্তেই অনুপমাকে হাসি মাখানো মুখে ফেন্সিংয়ের ফটক পেরিয়ে আসতে দেখে সব রাগ উবে যায়। সত্যি বড়ো ভালো মেয়েটা।

মৌসুমী ফুলের বাগানের মাঝ দিয়ে সরু লাল কাঁকরের আর্ক-ওয়ে,

ছু'পাশে মুড়ি পাথরের মালা। মরমর মরমর শব্দ হয় অনুপমার জুতোর চাপে। হেলে ছুলে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে অনুপমা।

সমিও এগিয়ে যায় সবুজ বেতের চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে।—কী রে, লোক পাঠালুম সকালে এলি না যে?

—এমনি। শরীরটা ভালো ছিলো না।

তাই কি? না। সকালে অনুপমার সারা দেহে মনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। অনেক চেষ্টায় শক্তি এনেছে শান্তনুর সামনে এসে দাঁড়াবার।

—তুই আসবি না ভেবে শান্তদা গেলো কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে

—ও।

বেতের কেদারাটা টেনে নিয়ে বসলো অনুপমা। মুখে চোখে একটু স্বস্তি ফুটলো। যাক্, শান্তনু নেই।

হিরণ্ময়ী বললেন, তোরা থাক্ তা হলে বাসায়, আমি যাই অনুর মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হিরণ্ময়ী চলে গেলেন। অনুপমা ঠোঁট টিপে হাসলে একবার, সমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে।—মাসিমা তোকে ধমক দিচ্ছিলেন মনে হলো, কেন রে?

সমিতাও হাসলে।—না রে, ধমক নয়। বলছিলো আমার কাটা কাটা কথার জন্যেই নাকি মা কাছে রাখতে চায় না আমায়, এখানে পাঠিয়েছে।

—হুঁ। পাশের বাড়ির ছেলেটির জন্যে, না কাটা কাটা কথার জন্যে ভগবান জানে! বিদ্রূপের দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপমা।

মুখোমুখি বারান্দায় বসে রইলো ওরা ছু'জনে। বাংলো-পিওন বিশ্বনাথকে ডেকে একবার বললে চিক ছু'টো তুলে দিতে। তারপর মোটা মোটা থামের ফাঁকে যতখানি গেছো আকাশ দেখা যায়,

তাকিয়ে রইলো। কথা নেই। সমিতার হাতে শুধু পুলির দড়ি-জোড়া। পাখাটাকে টেনে একবার এদিকে আনছে, আবার পাঠাচ্ছে ও-কোণে।

পাশের বাংলোর বাগানে মিসেস রবিনসন বাগিচা তদারক করে বেড়াচ্ছে, বাচ্চা ছেলেটার হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে।

পাঁউরুটির প্যাঁটরা মাথায় লোকটা চলে গেলো। সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ করে এসে দাঁড়ালো ডেয়ারি ফার্মের লোকটা। দুধের বোতল দুটো নামিয়ে রেখে সেও চলে গেলো।

ধোপদুরস্ত কালোপাড় শাড়ি পরে আয়াটা সার্ভেন্টস-কোয়ার্টাসের দিকে যাচ্ছে। সেদিকে চোখ গেলো সমিতার।

বললে, এতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাপুঃ চোখে লাগে। জমাদারনীটা অবধি রোজ কাপড় বদলায়।

অনুপমা হাসলে।—হুঁ।

—কথা বলছিস না যে। কী হলো তোর?

—না, কিছু না। এমনি।

—শান্তদা দেখলে তো—জানিস, শান্তদা কী বলে? সমিতা হেসে উঠলো। বললে, তুই নাকি দিনে পাঁচ কোটি দশ লক্ষ কথা বলিস। হো হো করে হেসে উঠলো সমিতা।

অনুপমাও একটু মুচকে হাসলে। তারপর আবার চুপ করে রইলো।

পশ্চিমের মেঘটা এদিকে ক্রমশ লাল হয়ে আসছে। লাল আর হলুদ মেশানো একটা জাফরানি আলো এসে পড়েছে। ফুলের পাপড়িগুলোর রং গেছে বদলে, চিকচিক করছে। সামনের পিচের রাস্তাটাও। সমাহিত শান্তিতে পৃথিবীটা যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিঃস্ব।

—কী এতো ভাবছিস বল তো? সমি প্রশ্ন করে।

কিছু না।

কিছু কি নয়? না। সত্যি কিছু ভাবছে না অনুপমা। তবু অনেক, অনেক কিছু ভাবার চেয়েও যেন গভীর। ভাবনা চিন্তার শেষ সীমানার না-ভাবা।

মনে মনে রোমন্থন করে অনুপমা। সকালের সেই দৃশ্যটা।

—ঐ যে, শান্তুদা। সাইকেল-রিক্‌শাটা গেট পার হতেই সমিতা বলে উঠলো। বেশ কিছুটা স্বস্তি পেলো যেন।

খুশী খুশী চোখে এগিয়ে এলো শান্তনু।—যাক্, অনুও এসে গেছে।

—কী ব্যাপার? সমিতা প্রশ্ন করলে।

—তোদের সিনেমা হাউসটার কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা দেখবার ইচ্ছে হলো। তাই টিকিট কিনে আনলাম তিনখানা। তারপর অনুপমার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার আবার অমত নেই তো?

কথা বললে না অনু, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালে। অর্থাৎ আচ্ছা। ঠিক যেন প্রশ্নের উত্তর নয়। অনিচ্ছার সম্মতি।

সমিতা বলে উঠলো, মাসিমা যে নেই। ক'টা বাজলো?

—এখুনি বেরুতে হবে। মা নেই?

—অনুদের বাড়ি।

—সুখিয়াকে দিয়ে চাবিটা পাঠিয়ে দে না।

তা নয়। মাসিমার কথাগুলো তখনো মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে সমিতার। চট করে কিছু উত্তর দিতে পারলো না। কী করে তুলবে ও আসল কথাটা। যাক, আরেকবার নয় বকুনি খাবে।

কিন্তু মাসিমার কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়।

সিনেমা ঘরে পৌঁছে অনুর পাশে বসতে যাচ্ছিল শান্তনু, একরকম ঠেলে সরিয়ে দিলে সমি।

—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

ছুটো দীর্ঘ, দীর্ঘ ঘণ্টার একটা মুহূর্তও উপভোগ করতে পারলো না শান্তনু। কেমন যেন তালকাটা নাচের মতো। সুর ভুলের গান।

অনুপমা হঠাৎ বদলে গেছে কি! সেই সশব্দ খুশখেয়ালের হাসি নেই, নির্বাক। চুপচাপ বসে আছে। ছোট ছোট উত্তর। নেহাত অনিচ্ছার সাড়া।

একটা নতুন চেতনার আভাস ভাসছে অনুপমার মনে। বারবার শুধু মনে পড়ছে সেই কয়েকটা টুকরো কথা।

পর্দার আড়ালে ছিলো অনুপমা। হঠাৎ ঘরের ভেতর গলার স্বর শুনতে পেলো।

মা আর বাবা কথা বলছে! সরে আসতে যাচ্ছিল, নিজের নামটা শুনে থমকে দাঁড়াতে হলো অনুপমাকে।

—এই ভাবে মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাও? গলার স্বর ভারি হয়ে এলো বনবিহারীবাবুর।

রত্নমালার কণ্ঠেও কান্নার আভাস। - আমারই কি কষ্ট হয় না ভাবো?

—অনুর বিয়ে দেবো আমি আবার।

রত্নমালা নিশ্চুপ।

—হেসেখেলে বেড়ায় বলে কি বুঝতে পারি না। ওর ভেতরটা -

—চুপ করো তুমি। এসব আর শুনিও না আমাকে। সত্যি করেই হয়তো রত্নমালা আঁচল চাপলেন চোখে।

বাপের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা স্পষ্ট কানে এলো অনুপমার।

— শান্তনুকে বেশ লাগলো আমার। বনবিহারীবাবু বললেন।

রত্নমালার কণ্ঠস্বরে আনন্দের চমক। -সত্যি, চমৎকার ছেলেটি।

—ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ।

মৃদু হাসির রেশ বাজলো রত্নমালার গলায়।—কি ঝগড়াই ছিলো, শান্ত এসে আমার কাছে লাগাচ্ছে অনুর নামে, অনু গিয়ে লাগাচ্ছে, হিরণদির কাছে।

—ক'দিন থেকে দেখছি, ওদের দুটিতে বেশ ভাব।

—হবেই তো।

—তা নয়। দু'জনের মধ্যে—

কথাটা শেষ করতে বাধো বাধো ঠেকলো হয়তো।

রত্নমালা উত্তর দিলেন, ও তোমার মনের ভুল। কিংবা কি জানি!

—শান্তনুর সঙ্গে বিয়ের চেষ্টা করলে কেমন হয়?

ব্যাস্। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি অনুপমা। পা টলছিলো ওর। সোজা চলে এসেছিলো ও শোবার ঘরে। দরজায় খিল এঁটে বিছানায় লুটিয়ে পড়েছিলো। বুকভরা ব্যথা নিয়ে। শান্তনু! শান্তনুকে কি ও ভালোবেসে ফেলেছে? হয়তো। বাবা তো ভুল করে না। বারবার শান্তনুদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় কেন। আগেকার মত কৈ সময়টা একঘেয়ে লাগে না তো। অপেক্ষার ঘাড়ের কাঁটা খুঁড়িয়ে চলে কেন। শান্তদার সঙ্গে কথা কয়ে, বেড়িয়ে কতো সময় কেটে যায় অথচ মনে হয় কেন এতো ছোট সময়, অল্প সময়।

শান্তনুর কি অনুপমাকে ভালো লাগে? কে জানে।

আরো কয়েকটা দিন। একটু একটু করে সহজ হয় অনুপমা।

প্রতিটি কথায় সংযত বাঁধুনি। আশঙ্কার ধীরতা ভাবে ভঙ্গিতে। নেই সে হাসির হঠকারিতা। নেই সে মুখ্রালাপের প্রলাপ।

নিঃশব্দে এগিয়ে চললো দু'জনে।

চাঁদমারির মাঠের পাশ দিয়ে। দেওদার পাতার চাঁদোয়ার নীচে লম্বা পিচের সড়ক। নির্জন। শান্ত স্তব্ধ। সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলো-ছায়ার কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ইস্পাতের পাতের মতো চকচকে রাস্তায়। কাঁটাবেড়ার কচি পাতায় নরম রোদের ঝিলক, বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ।

কালভার্টের পাশে সিমেন্টের বাঁধানো বেদীতে বসেছিল এক-জোড়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণ-তরুণী। ছেলেটির সুপুষ্ট হাতখানা আদরে জড়িয়ে আছে মেয়েটির কটিদেশ। চোখে সোহাগের দৃষ্টি দু'জনেরই।

পিছনে বেদীর গায়ে ঠেস দিয়ে আছে বাইকটা।

হঠাৎ উঠে পড়লো ওরা, শান্তনু আর অনুপমা কাঁছে এসে পড়েছে তখন। মেয়েটিকে বাইকের সামনে বসিয়ে উধাও হলো। শান্তনু মৃদু হেসে তাকালো অনুপমার মুখের দিকে। অনুপমা কিন্তু মুখ ফেরালো না, আড়চোখে একবার তাকিয়েই অন্যমনস্ক হলো।

কোন কথা বললে না শান্তনু, সম্মতি ভিক্ষে করলে না অনুপমার কাছে। ধীরে ধীরে বেদীটার দিকে পা বাড়ালে।

—শান্‌তো-দা।

চেঁচিয়ে টেনে টেনে ডাক দিলে সমিতা।

পিছন ফিরে তাকালে দু'জনই। দুপাশের গাছগুলো ঝুঁকে রয়েছে রাস্তাটার ওপর, মাঝখানে সরু আর লম্বা মসৃণ পথ ছুটে গেছে অনেক, অনেক দূর অবধি। চোখ যায় না। সমিতা কিন্তু খুব বেশী দূরে নেই। হাতের পাতাজোড়া মুখের কাছে চোঙার মত করে আরেকবার চেঁচিয়ে ডাকলে সমিতা ছুটতে ছুটতে। তারপর থেমে পড়ে জুতোর স্ট্রাপ বাঁধায় মন দিলে।

দু'বার হাতছানি দিয়ে বেদীটায় এসে বসলে শান্তনু, আর পাশেই অনুপমা। বেশ কাছাকাছি। সমিতার আসতে কয়েক মিনিট লাগবে। অথচ। শান্তনুর মদো রক্তে হঠাৎ মাতাল হাওয়া দুলে উঠলো। ইচ্ছে হলো এখনি, এই মুহূর্তে—ভাল করে তাকিয়ে দেখলে শান্তনু। কামনারাঙা লোভাতুর চোখে। অনুপমার দেহের যৌবন-রেখার দিকে। পাতলা অর্গ্যাণ্ডির ব্লাউজে বুকের উদ্দামতা পড়েছে ঢাকা। শাড়ির আঁচলটা কাঁধের পাশে। অন্তদিকে

তাকাবার ভান করে অপাঙ্গে তাকালে শান্তনু। বুকের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে গেছে গোলাপী রঙের ব্লাউজটা গোল গলার সীবনপ্রান্তের বন্ধন ডিঙিয়ে তপ্তোল্লাসের তরঙ্গ। অনুপমার অধীর উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে ওর প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে। থর থর কাঁপছে অনুপমা। কণ্ঠহারের চকচকে লকেটও। যৌবন দেহের প্রতিটি ছন্দে। শ্বেতপাথরের সুডোল বাহু। সমিতার জুতোর আওয়াজ আসছে খুটখুট করে। কিন্তু পাশাপাশি তিনটি মোটা গুঁড়িতে ঢাকা পড়ে আছে সমিতা।

শান্তনুর উষ্ণ হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো অনুপমা। চিবুকের ওপর অনুভব করলে তপ্ত নিঃশ্বাসের প্রলেপ।

অবশ দেহটা আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করলে অনুপমা। দুর্বল চেষ্টায়।

সমিতাকে দেখা গেলো।

—এই সরো, আমি মাঝখানে বসবো।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না অনুপমার চোখে। সমস্ত শরীরে তার কে যেন আগুন ছিটিয়ে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করলে অনুপমা। গাল দু'টো চেপে রইলো বালিশে। হাতের আঙুলগুলো উল্টে রাখলো চাদরের ওপর। অসহ্য একটা যন্ত্রণা। ঘুম আসে না, ঘুম আসে না তবু। টেনে টেনে হাতটা ঘষলে বিছানার উপর।

কেমন একটা লজ্জা। অস্বস্তি। ভোর হলো, রোদ বাড়লো। তবু শান্তনুর উদ্দেশে পা বাড়াতে পারে না। বিষাক্ত একটা সাপের টুঁটি চেপে ধরে আছে যেন। নিজেকে বড়ো অসহায় বোধ করছে অনুপমা।

আহারের পর খালিপায়ে এসে বসলো সে। বারান্দার ডেক-চেয়ারে।

হিরণ্ময়ী এসেছেন। শান্তনুর মা। ভাসা-ভাসা কথালাপের আওয়াজ আসছে কানে। টুকরো টুকরো ভাঙা ভাঙা কথা।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো অনুপমা। চুপ করে অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ। তারপর চলতে শুরু করলে।

ওপাশের ফটকটা দিয়ে ঢুকলে অনুপমা। সামনাসামনি এতো-খানি পথ হেঁটে যেতে কী এক অস্বস্তি। দূর থেকে শান্তনু তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। মাথা নিচু করে এতোখানি যেতে পারবে না অনুপমা। তার চেয়ে ওপাশের ফটকটাই ভালো। হঠাৎ গিয়ে। হাজির হবে একেবারে শান্তনু আর সমিতার পিছনে।

কিন্তু কৈ! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। শান্তনু নেই, সমিতা নেই।

পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো অনুপমা। ধীরে ধীরে পর্দাটা সরিয়ে এক পা ভেতরে দিয়েই—

আসতে যেটুকু সময় লেগেছিল, ফিরতে অনেক কম। দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলে অনুপমা।

বিয়ের ঠিক তিনমাস পরেই রঞ্জন মারা গিয়েছিলো। বুক ঠেলে উঠেছিলো ব্যথা। চোখে নিঃস্বতার অশ্রু নেমেছিলো। কপাটে খিল দিয়ে গুমরে গুমরে কেঁদেছিলো অনুপমা।

আজ আবার কাঁদলে। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। রত্নমালা হয়তো একবার ডাকাডাকি করে ফিরে গেলেন। আস্তে আস্তে উঠে বসলো অনুপমা। ঘরের কোণে ঢুকেছে আবছা অন্ধকার। দুপুরের রোদ সোনা হারিয়েছে।

নেমেছে নীলাভ কুয়াশা। সন্ধ্যার আকাশে ব্যর্থ বিহঙ্গের কান্না অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো অনুপমা।

রঞ্জন মারা যাবার পরেও আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো অনুপমা।

আজ আবার দাঁড়ালো।

রূপ? বিতৃষ্ণার হাসি চমক দিলো ঠোঁটে।

গলার হারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। খুললে হাতের কঙ্কণ, সারা দেহের অলঙ্কার। খুঁজে বের করলে সেই পুরোনো দিনের সাদা ধবধবে থান কাপড়। নিপাড় মোটা সুতোর শুভ্রতায় নিজেকে ঢাকলে। পায়ের নীচে ফেললে রেশমী অঙ্গবাস, লোহিত লালিত্য। রঙের রোশনাই নিভে গেলো। পাপড়ি খুললো একটি রজনীগন্ধার অন্ধ কলি।

আয়নার দিকে, নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলো অনুপমা। পূর্ণ যৌবন শ্বেতশিউলির চোখের কোণে অশ্রুবিন্দুটা হেসে উঠলো হঠাৎ।

ভাবলে, চাঁদমারির ময়দানকে পাশে ফেলে লম্বা পিচের সড়ক ধরে আজও হয়তো চলেছে শান্তনু। হিজল হরিতকীর সাঁঝের ছায়ায়। নির্জন পথ। কালভার্টের পাশে সেই সিমেন্টের বাঁধানো বেদীটায়। শান্তনু গিয়ে বসবে। সমিতাও।

মাঝখানে নয়।

সতী ঠাকরুণের চিতা

গল্পের রস মিলবে না হয়তো, কিন্তু গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ এই যশাই পণ্ডিতের উপাখ্যান।

জেলা বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ পুবে ময়নাপুর কাঁসারীদের গ্রাম। গ্রামের এদিকে একখানা ভাঙা পুরোনো বাড়ি, লোকের মুখে—দেওয়ানজীর কাছারি। আশে পাশে আরও কয়েক ঘর বামুন কায়েতের বাস থাকলেও কিন্তু গাঁয়ের আর সবাই ডোম।

সে কি আজকের কথা। অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে যেদিন দেশে ফিরলেন, ময়নাপুরের লোক তখন বিষ্ণুপুরকে বলতো শহর, বাঁকুড়া ছিলো বিদেশ।

বিষ্ণুপুরে একটা মসলাপাতির দোকান ছিলো অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের। বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে গ্রামে ফিরলেন তিনি।

ফিরে এসে দেখলেন বদলে গেছে সব রাতারাতি। ডোমপল্লীর নাম হয়েছে পণ্ডিত পাড়া।

কি ব্যাপার! ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। ডোমপল্লীর যশাই সিদ্ধপুরুষ হয়েছে। পণ্ডিত হয়েছে। লোকে তাকে সসম্মানে যশাই পণ্ডিত বলছে।

শুনে প্রথমটা হেসেছিলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। হাসি পাবারই কথা। ডোমের ছেলে হয়েছে পুজারী ঠাকুর। কালে কালে কতোই

দেখতে হবে। সারা দেশটা যে উচ্ছন্নে যাচ্ছে তা অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম কর্ম আর রইলো না বোধ হয়, সব খ্রীষ্টান হয়ে গেলো। তা না হলে অমন যে বাপঠাকুর্দার জমাট ব্যবসা, তাও কিনা অচল হলো। মেথর মুদ্দোফরাশে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে জাহাজে করে মসলাপাতি এনে বাজারে ঢেলে দিলো সাহেব কোম্পানির লোক, আর তাই কিনা দু'পয়সা দর সস্তার লোভে হুমড়ি খেয়ে কিনলো সকলে।

ক্ষোভের সীমা ছিলোনা অকলঙ্ক বাড়ুজ্যের। ময়নাপুরে ফিরে দেখলেন গাঁয়ের মানুষের গায়েও সেই হাওয়া লেগেছে।

চারপাশে মাটির দেয়াল তুলে খড়ের চালা দেয়া ছোট্ট একখানা ঘর—তাই নাকি যশাই পণ্ডিতের মণ্ডপ। ধর্ম ঠাকুরের নাম বাঁকুড়া রায়।

যেমন পূজারী তেমনি দেবতা। তা হোক্ কিন্তু বামুন কায়েত-গুলোও গিয়ে ভিড় করে কোন লজ্জায়?

কেন, গাঁয়ে যখন মড়ক নামলো তখন কোথা ছিলেন বাঁড়ুজ্যে মশাই। কে থামালো সেই মড়ক? শিবেন মিস্ত্রির মেয়েকে সেবার গোখরোয় কাটলো, কে বিষ ঝাড়লে? দু'দিনের জ্বরে সদাশিব মুখুজ্যের বড়ো ছেলে ধড়ফড় করে মরলো, শ্মশানে গিয়ে সারারাত মন্ত্র পড়ে যশাই পণ্ডিতই না বাঁচিয়ে তুললো তাকে? জমিদার অনন্ত হাজরার বুড়ি দিদিমার আঠারো বছরের বাত এক কলি শিকড় দিয়ে সারায় নি যশাই পণ্ডিত?

শুনে মনে মনে চটতেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, মুখে বিদ্রূপের হাসি হাসতেন।

—নির্বোধ। কুসংস্কারাক্রান্ত মুর্খের দল সব। মনে মনে বলতেন আর নিজের আত্মাভিমানের গায়ে প্রবোধ বুলোতেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না চুপ করে, তাঁর

নিজের সংসারও কলঙ্কিত হতে চলেছে, অথচ কোন দিন সন্দেহ হয়নি তাঁর।'

অক্ষয় তৃতীয়ার রাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে এসে দাওয়ায় বসলেন হুঁকো হাতে।

গৃহিণীকে ডাকলেন দু'বার, সাড়া পেলেন না। বোধহয় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, ভাবলেন। তাই নিজেই নিভন্ত উনান থেকে আঙরা তুলে টিকে ধরালেন কোনোরকমে।

তারপর দাওয়ায় বসে অন্ধকার মাঠের দিকে চোখ মেলে বসে রইলেন।

ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ—ডুগি বাজছে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়। একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে।

নূতন কোনো ভণ্ডামি শুরু করেছে ডোমের ছেলেটা, ভাবলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

সামনে পুকুরের দিকে চোখ গেলো। ওদিকের ঘাটে এক সারি মেয়ে স্নান করতে নেমেছে নাকি এতো রাত্তিরে।

সে দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে রইলেন। হ্যাঁ, সাদা ফুটফুটে কাপড়টাই শুধু দেখা যাচ্ছিলো। কারা যেন এগিয়ে আসছে তাঁর দিকেই।

—কে? ক্রোধের স্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

যারা আসছিলো হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা। তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো একসময়। কোন কথা না বলে মাথা হেঁট করে ঢুকলো তারা।

—কল্যাণী!

আবার চীৎকার করে ডাকলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

মাথা হেঁট করে সামনে দাঁড়ালো বড় মেয়ে কল্যাণী।

—কোথায় গিয়েছিলে এতো রাতে?

মৃদু স্বরে উত্তর এলো, পণ্ডিতের মন্দিরে।

—পণ্ডিত ? ক্ষিপ্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। —শালা ডোম, ভেল্কি দেখিয়ে পণ্ডিত হয়েছে। আমার অনুমতি না নিয়ে আর কোনদিন যাবে না তোমরা এই বলে দিলাম শেষবারের মতো।

—যাবো না আর। মৃদু উত্তর এলো।

কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভুলতে সময় লাগলো না কল্যাণীর। তা না হলে সারা গাঁয়ে এতো কানাঘুষো চললো কেন, ডোম পল্লীতে হাসির হুল্লোড় উঠলো কেন কল্যাণীর নামে!

সকলেই প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতো, সকালে পুজোয় বসতে দেরি হয়ে যেতো যশাই পণ্ডিতের। কোষাকুষি ধুয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে সময় কাটাতো কেবল। তারপর একসময় স্নান সেরে এলোচুলে এসে হাজির হতো কল্যাণী। সমস্ত শরীরে যৌবনের পুষ্প ফুটিয়ে, মুখে মুক্তোর হাসি দুলিয়ে এসে বসতো কল্যাণী। পুজোর উপকরণ সাজিয়ে দিতো।

ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায়ের পুজোয় বসতো তখন যশাই পণ্ডিত, উচ্চ গম্ভীর স্বরে মন্ত্রপাঠ শুরু করতো।

বাঁকুড়া রায়ের মূর্তির পায়ে একটি জবাপুষ্প রেখে মন্ত্রপাঠ চলতো, যতক্ষণ না সেটি নীচের ঘটের মুখে এসে পড়ে মন্ত্রের শক্তিতে।

জবা ফুলটি ঘটের জলে ছিটকে এসে পড়লে তবেই পুজো সাঙ্গ হতো, শান্তিজল বিতরণ করতো যশাই পণ্ডিত।

যেদিন কল্যাণী আসতো না, সেদিন জবাপুষ্প বাঁকুড়া রায়ের চরণেই থাকতো, কিছুতেই ঘটের মুখে এসে পড়তো না।

যশাই পণ্ডিত বলতো, ধর্মঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কল্যাণী তাঁর সেবাদাসী। কল্যাণীর সেবা না পেলে খুশী হবেন না।

লোকে বিশ্বাস করতো সে কথা। বলতো, ভক্তির গুণে যশাই

ডোম হয়েও পণ্ডিত। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হলেন জাগ্রত দেবতা, তাই ব্রাহ্মণকন্যার সেবা না পেলে অতৃপ্ত থেকে যান।

এ-কথা শুনে হাসতো শুধু ডোমপল্লী। যশাই পণ্ডিত হবার পর তার আত্মীয়স্বজনরাও পণ্ডিত নাম নিয়েছিলো, অন্য ডোমদের ছোঁয়া খেতো না তারা। বামুনদের যেমন উপবীত, তেমনি পণ্ডিত ডোমদের 'তাম্র' হত। ধর্মঠাকুরের পুজো দিয়ে হাতে একটি তামার আংটি পরতো পণ্ডিত ডোমরা; 'তাম্র' না হলে মণ্ডপে ঢুকতে পেতো না তারা। 'তাম্র' হওয়ার অধিকারও ছিলো না অন্য অন্য ডোমদের।

মনে মনে তাই রাগ ছিলো তাদের যশাই পণ্ডিতের উপর।

তাই শেষ পর্যন্ত অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের কানে উঠলো কথাটা।

ধর্মরক্ষার কোন পথ খুঁজে না পেয়ে গ্রামেরই এক আশি বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি। আর নিজের বৈঠকখানায় বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

বললেন, স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, ঐ ডোম কলঙ্ককে গ্রাম থেকে তাড়াতে হবে।

শুনলো সকলে, অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যের বিষ্ণুমূর্তিকে প্রণামও জানিয়ে গেলো দু'এক দিন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে ভিড় কমলো না এতটুকু। রোগে মড়কে আগের মতই ছুটে যেতো তারা যশাই পণ্ডিতের কাছে।

হাঁসের পালক থেকে যেমন জল খসে পড়ে, যশাই পণ্ডিতকে স্পর্শও করে না কোন অপবাদ। আর যেটুকু হাসাহাসি, কানাচুপি তাও ঐ কল্যাণীকে ঘিরে।

অথচ সে অপবাদে কান দেয় না কল্যাণী। বৃদ্ধ স্বামী তার খুকখুক করে কাশে, গল্প করে। আর কল্যাণী থাকে যশাই পণ্ডিতের আখড়ায়।

গভীর রাতে কোনো কোনোদিন আখড়া থেকে বেরিয়ে বাড়ির

পথে ধরে কল্যাণী, দু'একজন যারা দেখে চাপা গলায় বলে, ডাইনি। পাশের লোক শুনে হাসে।

—কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। বললে বুড়ো বুড়িরা, কান্নার রোল উঠতে শুনে।

—বামুনদের মেয়েটার রাস্তা পরিষ্কার হলো এবার। বললে ডোমপাড়ার ছেলে ছোকরারা।

যশাই পণ্ডিতের কানে যখন খবর পৌঁছলো, কল্যাণীর বুড়ো স্বামীকে তখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শুনেই শ্মশানে ছুটলো যশাই।

শ্মশানে গিয়ে যখন পৌঁছলো, চিতা সাজানো হয়ে গেছে। পাশাপাশি জোড়া চিতা।

একপাশে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। হাত আর পা শক্ত করে বাঁধা তার। মুখের স্বর রুদ্ধ করে আছে কাপড়ের বাঁধন।

সতী হবে কল্যাণী!

—সতীই ছিলো কল্যাণী মা! বললেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে, তারপর নিজে পরীক্ষা করে দেখলেন কল্যাণীর বাঁধনগুলো।

ওদিকে গনগনে আগুন জ্বলছে। অন্ধকারে তামাক খেতে খেতে চাঁড়াল দুটো মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে কল্যাণীর দিকে।

না কল্যাণীর চোখে জল নেই। একদৃষ্টে যশাই পণ্ডিতের আখড়ার দিকে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। ওখানে একটা লেলিহান শিখা দুলে দুলে উঠছে আকাশে।

এমন সময় হঠাৎ খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে এলো যশাই।

—কল্যাণী! কল্যাণী! চিৎকার করতে করতে এসে পৌঁছলো যশাই।

আর পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে কল্যাণীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে বাধা দিতে গেলো। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো যশাই। কল্যাণীর বাঁধন কেটে দিলো কোমরের খান্নালো ছুরি দিয়ে।

হৈ হৈ করে উঠলো সকলে।—কল্যাণী সতী হবে, কল্যাণী সতী হবে।

রুখে দাঁড়ালো যশাই। বললে, হ্যাঁ কল্যাণী সতীই। আর আমার বাঁকুড়া রায়, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হয় তা হলে কল্যাণী সধবা থাকবে, এ মড়া বাঁচিয়ে তুলবো আমি।

মড়া বাঁচিয়ে তুলবে? যশাই পণ্ডিত মড়া বাঁচিয়ে তুলবে?

অসম্ভব নয়—সকলই স্বীকার করলে।

আহা তাই যেন হয়। হঠাৎ অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে যশাই পণ্ডিতের পা জড়িয়ে ধরলে।

বললে, বাঁচিয়ে তোলো পণ্ডিত, কল্যাণী মাকে যেন চিতায় উঠতে না হয়।

বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে।

যশাই শান্ত করে বললে, আমার ধর্মঠাকুর যদি সত্যি হয় তা হলে চিতা থেকে উঠে আসবে কল্যাণীর স্বামী।

হাসি দেখা দিলো কল্যাণীর মুখে, ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এলো সে, গলায় আঁচল দিয়ে যশাইকে প্রণাম করলে।

যশাই তখন পাগলের মতো। মুখে কেবল একটি কথা, মড়া বেঁচে উঠবে, মড়া বেঁচে উঠবে।

চিতার সামনে দাঁড়িয়ে, চিতা পরিক্রমা করতে করতে মন্ত্র পাঠ শুরু করলো যশাই।

খবর শুনে এদিকে সারা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছে। থেকে থেকে শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা, ডুগি বাজাচ্ছে ডোমের দল।

সকলের চোখ চিতায় তোলা বুড়োর মুখের দিকে। উদ্‌গ্রীব

উৎকণ্ঠায় সেদিকে তাকিয়ে আছে সবাই। চোখে আশা, মনে আশঙ্কা।

শুধু একজনের মুখে শান্ত হাসি আর স্থির বিশ্বাস। যতই সময় যাচ্ছে, যতই তীব্র হয়ে উঠেছে যশাই পণ্ডিতের কণ্ঠস্বর, অবিশ্বাস উঁকি দিচ্ছে যেন সকলের চোখে। কিন্তু কল্যাণী একাগ্র মনে তাকিয়ে আছে যশাই পণ্ডিতের মুখের দিকে। ও জানে, মৃতকে জীবনদান করতে পারে যশাই।

গ্রামের লোকেও তো দেখেছে শ্মশানে সারারাত মন্ত্র পড়ে সদাশিব বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলো যশাই।

কিন্তু রাত ফর্সা হলো, ভোর জাগলো, তবু চিতার ওপর বুড়োর শবদেহ যেমনকার তেমনি। অথচ সূর্য উঠলে আর কোন আশাই থাকবে না। মড়া বাঁচানোর মন্ত্র সূর্য উঠলে নিষ্ফল হবে।

হঠাৎ চুপ করলো যশাই। সারা শরীরে ঘাম ঝরছে তার তখন। কপালের শিরাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। গলার নলীটা বাঁশের মত শক্ত হয়ে গেছে।

মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে হঠাৎ চাঁড়ালের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করলো যশাই।

আবার হাত পা বেঁধে ঘৃত স্নান হলো কল্যাণীর। জোড়া চিতায় পাশাপাশি তুলে দেওয়া হলো বৃদ্ধ স্বামীর পাশে সতী ভার্যাকে।

উদ্দাম বেগে ঢোলক বাজলো, শাঁখ বাজলো। উলুধ্বনি আর চিৎকারে চাপা পড়ে গেল কল্যাণীর স্বর। চিতা জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে।

কল্যাণীর মাথার সিঁদুর আর পায়ের আলতা বেলপাতায় মুছে নিয়ে সযত্নে মাথায় ঠেকালো গ্রামের মেয়েরা। তারপর বাড়ি ফিরলো।

ফেরার পথে একজন বললে, যশাই পণ্ডিতের মন্ত্রে ভুল ছিলো।

তা না হলে সদাশিব বাঁড়ুজ্যের বড়ো ছেলেকে বাঁচাতে পারলো আর একে পারলো না?

অনেকে সায় দিলো এ-কথায়। কিন্তু অন্য সকলে বললে, তা নয় আসলে কল্যাণী সতী ছিলো না। তাই কাজ হলো না মন্ত্রে।

আর কল্যাণী যে সতী ছিলো না তা তো সকলেই জানতো। তা না হলে মাঝরাত পর্যন্ত যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় থাকতো কেন?

ফিরে এসে কিন্তু দেখলে তারা, বাঁকুড়া রায়ের মন্দিরের দরজায় দমাদম লাঠি পিটছে যশাই।

এর আগে একটা দিনের জন্যেও বাঁকুড়া রায়ের মণ্ডপে আসেন নি অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। সেদিন কিন্তু থাকতে পারলেন না, এসে হাজির হলেন সেখানে।

যশাই তখন লাঠি পিটছে কপাটে।

দু'একবার ডাকলেন—যশাই শোনো, যশাই।

কানে গেলো না যশাইয়ের। ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। দু'চোখ বেয়ে তখন জল ঝরছে তাঁর।

সেদিকে যশাইয়ের চোখ গেলো হঠাৎ। বাঁড়ুজ্যের কাছে এসে বললে, বামুন মশয়, বাঁকুড়া রায় মিথ্যে, বাঁকুড়া রায়ের পুজো আর করবো না আমি।

এই বলে কাঁধে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে গেলো যশাই।

দিন মাস বছর কেটে গেলো যশাই পণ্ডিতের আর কোন খোঁজ মিললোনা। অনেকে ভুলে গেলো, অনেকে বললে, কল্যাণী সতী হওয়াতেই মনের দুঃখে আত্মঘাতী হয়েছে যশাই।

বাঁকুড়া রায়ের পুজো করেন অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে। গ্রামের ধর্মঠাকুর, জাগ্রত দেবতা, তাকে তো ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু তেমন ভিড় আর হয় না; তেমন বিশ্বাসও যেন নেই কারও।

ঠিক আগের মত তো নিজের চোখে কেউ দেখতে পায় না বাঁকুড়া রায়ের চরণ থেকে জবাপুষ্প ছিটকে ঘটের মুখে এসে পড়েছে।

লোকে দুঃখ করে বলে, যশাই পণ্ডিত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার আশীর্বাদও চলে গেছে।

তবে অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যে নিজের মনেই পুজো করেন। হয়তো সতীকন্যা কল্যাণীর শোক ভোলবার চেষ্টায়, হয়তো অনুতাপ আর অনুশোচনা দূর করার জন্যে।

সেদিনও এমনি পুজো শেষ করে শান্তিজল দিতে যাচ্ছেন সকলকে, হঠাৎ একজনের দিকে চোখ গেলো তাঁর।

—যশাই পণ্ডিত, তুমি!

হৈ হৈ করে উঠল সকলে। যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে, যশাই পণ্ডিত ফিরে এসেছে।

মুখে হাসি দেখা দিলো সকলের। কিন্তু যশাইয়ের চোখে তখন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। একরাশ মূর্তি নিয়ে এসে নামলো যশাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে সে বছরের পর বছর। যেখানে যে ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি পেয়েছে নিয়ে এসেছে সে, কখনও জোর করে কেড়ে নিয়েছে, কখনও চুরি করে।

পরীক্ষা করবে যশাই, কোন ধর্মঠাকুরের শক্তি বেশী, কোন্ দেবতা বেশী জাগ্রত পরীক্ষা করে দেখবে সে।

মন্ত্র পাঠ করে মড়া বাঁচাতে পারেনি সে। বাঁকুড়া রায় কি তা হলে মিথ্যে?

গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেলো। তীর্থযাত্রীদের ভিড় ভেঙ্গে পড়লো ময়নাপুরের মাঠে।

একটা দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালো যশাই, তারপর একে একে সব মূর্তিগুলো জলে ছুঁড়ে ফেললো। বাঁকুড়া রায়কেও ছুঁড়ে দিল জলের মধ্যে।

তারপর চিৎকার করে যশাই বললে, সব ঠাকুরকে জলে ফেলে দিলাম। এবার মন্ত্র পড়বো আমি, তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত জাগ্রত ঠাকুর সে আমার হাতে উঠে এসো।

এই বলে জলে হাত পেতে মন্ত্রপাঠ শুরু করলো যশাই।

মুহূর্ত কয়েক পরেই সকলে দেখলে একটি মূর্তি ঠেকেছে যশাই পণ্ডিতের হাতে।

মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো যশাই।—এ যে যাত্রাসিদ্ধি, যাত্রাসিদ্ধির ঠাকুর? আমার বাঁকুড়া রায় কোথায়?

আবার মন্ত্রপাঠ শুরু হলো। কিন্তু বাঁকুড়া রায় হাতের কাছে উঠে এলো না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যশাই। বাঁকুড়া রায় তা হলে মিথ্যা? বাঁকুড়া রায় জাগ্রত নয়? এতোদিন তা হলে মিথ্যার পুজো করে এসেছে সে?

তন্ন তন্ন করে খুঁজে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তিটা তুলে আনলে যশাই। তারপর লাঠির ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ করলে বাঁকুড়া রায়ের মূর্তি।

যশাই পণ্ডিতের আখড়ায় প্রতিষ্ঠা হলো যাত্রাসিদ্ধির।

আর অকলঙ্ক বাঁড়ুজ্যেকে তাড়িয়ে দিলো যশাই। বললে, যে বামুন নিজের মেয়েকে জীবন্ত পোড়াতে পারে সে জাত যেন এ মণ্ডপে না ঢোকে। বামুন ছাড়া সব জাতের পুজো নেবেন যাত্রাসিদ্ধি।

তার চোখের সামনে হয় তো ভেসে উঠতো সেই একটি দৃশ্য। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে গল্প করছে দু'জন চাঁড়াল। পাশাপাশি এক জোড়া চিতা সাজানো হয়েছে। আর কল্যাণী, পূর্ণ যৌবনা রূপময়ী কল্যাণীর হাতে আর পায়ে কঠিন বাঁধন। বাপ চিতায় তুলে দিচ্ছে নিজের কন্যাকে। জীবন্তে দগ্ধ হয়ে যেন চিৎকার করে উঠছে কল্যাণী, সে চিৎকার শুনতে পায় শুধু যশাই পণ্ডিত।

তাই জলন্ত চিতা দেখলেই উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠতো যশাই পণ্ডিত।

মৃত্যুর সময়েও যশাই তার শিষ্যদের আদেশ দিয়ে গিয়েছিলো, তাকে যেন চিতায় পোড়ান না হয়।

যশাই পণ্ডিতের নির্দেশ মত যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের ঠিক্ সামনে মৃত্যুর পরে তার শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়। আর, আর যশাই পণ্ডিতের শেষ নির্দেশ, বামুনদেরও আসতে দিও রামাই।

—বামুনদের ?

মৃত্যুর সময় মৃদু হাসি দেখা দিয়েছিলো যশাইয়ের মুখে। বলেছিলো, হ্যাঁ, রামাই, কল্যাণী হয়তো পরজন্মে আবার আসবে। হয়তো বামুনের ঘরেই জন্ম নেবে আবার। আমাকে এমন জায়গায় পুঁতে রাখবি রামাই, কলাণী এলে যেন তার পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কিন্তু লক্ষ জনের পায়ের শব্দে কি কল্যাণীকে চিনতে পারবে যশাই পণ্ডিত ?

যাত্রাসিদ্ধির মন্দিরের সামনে আজও হাজার মানুষের ভিড় জমে, যশাই পণ্ডিতের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় তাদের। দূর দূর দেশ থেকে আজও হাজার হাজার লোক আসে যাত্রাসিদ্ধির মেলায়।

জেলা—বাঁকুড়া, মহকুমা বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর থেকে সাত ক্রোশ দূরে ময়নাপুর। ময়নাপুরে যাত্রাসিদ্ধির পুজো দিতে যায় তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু কেউই হয়তো খবর রাখে না সতীদাহের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্যে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো ডোম পল্লীর একটি অশিক্ষিত পূজারী।

নকল্‌চি

বর্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইনের মাঝখানে মাঝারি গোছের স্টেশন বল্‌গনা। সেখান থেকে কাঁদর পার হয়ে গোবিন্দপুর, বেনুগঞ্জের দক্ষিণে যে ঊর্ধ্ববাস পুকুরটা, তারও পশ্চিমে নকল্‌চির কবর। দু'বছর আগেও উঁচু ঢিবিটা দেখে কবর মনে হতো, দু'বছর পরে হয়তো ক্ষেতের আল বলে ভুল হবে।

কাসেম আলিকে আমিও দেখেছি। কাসেম আলির গল্প শুনেছি তার চেয়েও বেশি।

ষাট বছরের বুড়ো, একটা চোখ কানা। তবু দু'চোখেই মোটা মোটা কাচের চশমা পরতো কাসেম আলি; ফ্রেমটা দু'কানে বাঁধা থাকতো কালো সুতোয়। পরনে ময়লা তেলচিটে লুঙ্গি; গায়ে একটা নোংরা ফতুয়া; হাতে লাঠির বাঁটে বাঁধা থাকতো একটা পিতলের দোয়াত, শোলা দিয়ে মুখটা বন্ধ করা। দু'কানে দুটো খাগের কলম, আর লাঠির বাঁটে দোয়াত দুলতে দেখলেই দূর থেকেও লোকে বুঝতে পারতো কাসেম আলি আসছে।

বার-বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলাম। ধান ঝাড়াই হচ্ছিলো সামনের উঠোনে।

টুকটুক টুকটুক করে সামনে এসে দাঁড়ালো কাসেম আলি।

—সেলাম ছোটবাবু।

প্রতিসেলাম জানিয়ে বললাম, কি চাই?

হাসলো কাসেম আলি।—চিনতে পারলেন না হুজুর? আমি নকল্‌চি কাসেম আলি।

—ও। বলেই নিজের কাজে মন দিলাম।

বিদেশ বিভুঁই থেকে এসেছি বহুদিন বাদে, জমিজমার একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে যাবো এই ভেবে। সুতরাং সময় কোথায় সময় নষ্ট করার।

কাসেম আলি একটু উসখুস করলো। তারপর বললে, কিছু কাজ বায়না দেবেন না ছোটবাবু? নথীপত্র, দলিল নকশা, পুঁথি পরচা—কিছু নকল করাবেন না হুজুর?

মাথা নেড়ে বললাম, না। কিন্তু এখনও নকল করতে পারো নাকি মিঞা সাহেব, চোখে দেখতে পাও?

হাড় জিরজির কাসেম আলির দন্তহীন মাড়ি দুটো হেসে উঠলো—দিয়েই দেখুন না ছোটবাবু, বড়ো কলমে বলেন বড়ো, ছোট কলমে বলেন ছোট কলমে।

বড় কলম হলো পুঁথিপত্রে ঠিক যেমনটি লেখা আছে হুবহু সেই হস্তাক্ষরের নকল, আর ছোট কলম হলো যে বায়না দেয় তার হাতের লেখা। কথাটা যে মিথ্যে নয় তা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি।

নকল করা কিন্তু কাজ ছিলো না কাসেম আলির। কম বয়সে গান লিখতো, ছড়া বানাতে পারতো মুখে মুখে। কবিগানের আখড়ায় কাসেম আলি এসে পৌঁছেছে শুনলে ভয়ে পিছু হটতো সবাই। দূর দূর গ্রাম থেকে যাত্রার দল এসে গান লিখিয়ে নিয়ে যেতো—পাঁচালী, শতনাম, আরও কতো কি। হিন্দুদের দেবদেবীর নাম কীর্তনের পুঁথি লিখে দিতো কাসেম আলি।

কিন্তু কাল হলো তার এই হিন্দুয়ানী।

মুসলমানরা বললে, কাসেম আলি কাফের হয়ে গেছে। রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সাবিত্রী সত্যবানের পুঁথি লেখে ও। লয়লা মজনু, শিরিন ফরহাদের প্রেমোপাখ্যানও যে ও লিখেছে, পীর দরগার গান,

'আল্লার কৃপা মুসলমান'—এসবও যে তার কলম থেকেই বেরিয়েছে সে-কথায় কান দিলো না কেউ।

আর কেউ কান দিলো কি না-দিলো সে দুশ্চিন্তা ছিলো না কাসেম আলির। ওর তখন ভরা বয়েস। চোখে রঙ, মনে স্বপ্ন।

পীরের দরগার সামনেই ছিলো একটা আমবাগান। সেই আমবাগানে বসে বসে সন্ধ্যের সময় গান গাইতো কাসেম আলি, একতারা বাজিয়ে। আর তার গান শোনবার জন্যে ভিড় করে আসতো গাঁয়ের মুসলমান মেয়েরা। তাদেরই মধ্যে একজন—মৌলবী সাহেবের মেয়ে হামিদাবানু। হামিদাবানু যে দিন না আসতো, গান জমতো না ওর।

শেষে একদিন মৌলবী সাহেবকে বলেই ফেললো কাসেম আলি। বললে, হামিদাবানুকে সে বিয়ে করতে চায়।

মৌলবী সাহেব রাজি হলো, কিন্তু শর্ত হলো বিয়ের কাবান লিখে দিতে হবে, জীবনে কখনও হিন্দুর দেবদেবীর গান বাঁধতে পাবে না সে, গাইতে পাবে না সে গান। কাসেম আলি তখন হামিদাবানুর প্রেমে পাগল। কাবান লিখে দিলে ও।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করা সোজা, পেট চালানো সহজ নয়। চারপাশে হিন্দুর গাঁ, 'আল্লার কৃপা মুসলমান' লিখলে তো পয়সা দেবে না তারা।

অগত্যা, গান বাঁধার কাজ ছেড়ে নকলচির কাজ শুরু করলো কাসেম আলি। কাবান লিখেছে সে হিন্দুর গান বাঁধবে না, গাইবে না। নকল করে দেবে না, এমন প্রতিজ্ঞা তো করে নি।

নথীপত্র, দলিল নক্শা, পুঁথি-পাঠ নকল করে দেওয়ার কাজ করতে শুরু করলো কাসেম আলি। নকল করতে করতে নকলচি হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। বড় কলম আর ছোট কলম। যে যেমনটি চায়। কেউ চায় পুঁথির মতো অবিকল হাতের

লেখা, কেউ বায়না দেয়, এমন নকল হবে যেন মনে হয় আমারই লেখা।

ছ'কানে ছটো খাগের কলম, হাতে লাঠির বাঁটে দড়িতে বাঁধা পিতলের দোয়াত ঝুলিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় কাসেম আলি। কার বাড়িতে কি পুঁথি আছে খোঁজ করে নকল করে আনে। আর পুঁথি তো কেউ বাক্স প্যাটরায় তুলে রাখে না, পুঁথি হলো স্বয়ং ভগবানের বাণী। কে কবে কোথায় স্বপ্নে পেয়েছে, পুঁথিতে কি লেখা আছে তাও পড়ে দেখেনি। পুজোর ঘরে রুপোর সিংহাসনে সাজিয়ে রেখেছে, সিঁহুর লেপেছে তার গায়ে, চন্দনের ফোঁটা পরিয়েছে, আর পুজো করেছে পুঁথিকে দেবতা ভেবে।

সুতরাং সে পুঁথিকে ছুঁতে দেবে কেন তারা।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর কেউ হয়তো দয়া করে পাতার পর পাতা খুলে দেখিয়েছে ছ'গজ দূর থেকে। আর তাই দেখে নকল করেছে কাসেম আলি। আর এই পুঁথি নকল করতে করতে নেশা ধরে গেছে তার। বায়না থাক বা না থাক, গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতিটি পুঁথি নকল না করে যেন শান্তি নেই।

এমনি ভাবেই কাটছিলো বছরের পর বছর।

মাঝে মাঝে হাসি পেয়েছে কাসেমের, হিন্দুদের হিন্দুয়ানী দেখে। অনেক অনুনয় বিনয় করে যখন কেউ ছ'গজ দূর থেকে পুঁথি খুলে দেখিয়েছে, কিংবা পড়ে শুনিয়েছে, তখন হঠাৎ কোনো কোনোদিন চিৎকার করে উঠেছে কাসেম, এ পুঁথি তো আমিই বেঁধেছি কর্তা। আমাকেই ছুঁতে দেবেন নি।

সত্যিই তাই। পয়ার ছন্দ মিলিয়ে ছোট বেলায় যে-সব পুঁথি লিখেছে কাসেম, এক হাত থেকে আর এক হাতে ঘুরে সর্বাঙ্গে সিঁহুর মেখে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেবদেবীর তুল্য মূল্য। মনে মনে হেসেছে কাসেম, তার লেখা পুঁথি পুজো করতে আপত্তি নেই, কেবল

তার ছোঁয়াতেই সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আশ্চর্য মানুষের মন। মাঝে মাঝে তাই রাগে সারা অঙ্গ রী রী করে উঠেছে কাসেমের।

জ্বলে উঠেছে শোধ নেবার জন্যে।

হামিদাকে বলেছে, পয়দা করলাম আমি, আমার ছেলে নয়, যে পুষ্যি নিলো সেই মালিক! তাজ্জব ধর্ম এ পৃথিবীর।

হামিদা বলেছে, আবার পয়ার বাঁধতে শুরু করো তুমি, হিন্দু গানই লেখো আবার। পেটও ভরবে, ওরাও জানবে তোমার গানের ইজ্জত।

কাসেম বলেছে, তোবা তোবা, কাবান লিখেছি মনে নেই?

হামিদা হেসে বলেছে, সে কাবান তো লিখেছো আমার জন্যেই, আমি বলছি হিন্দু গান লেখো তুমি।

তবু কথার খেলাপ করতে রাজি হয়নি কাসেম। একবার যা প্রতিজ্ঞা করেছে সে-প্রতিজ্ঞা ভাঙবে কি করে।

কাসেম আলির গল্প কারো অজানা ছিলো না, এ-সব কথা অনেকবার শুনেছিও। সকলে বলতো, কাসেম আলি মারা গেলে নাকি ওর বাড়িতে প্রাচীন পুঁথিপত্রের নকল পাওয়া যাবে অনেক।

কিন্তু পুঁথির নেশা তো তখন ছিলো না।

তাই ষাট বছরের বুড়ো, এক চোখ কানা কাসেম আলি যখন এসে দাঁড়ালো প্রথমটা চিনতেই পারিনি।

পরনে ময়লা তেলচিটে লুঙ্গি, গায়ে একটা নোংরা ফতুয়া। হাতের লাঠিতে একটা পিতলের দোয়াত সুতো দিয়ে বাঁধা, শোলা দিয়ে মুখটা বন্ধ। মোটা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় শুধু একটা ঘোলাটে চোখ।

চিনতে পারি নি।

ঠুক ঠুক করে এসে বললে, সেলাম ছোটবাবু।

বললাম, কি চাই।

উত্তর এলো, চিনতে পারলেন না হুজুর, আমি নকলচি কাসেম আলি।

মনে পড়লো। বললাম, না, কাজ তো, কিছু নেই কাসেম।

কাসেম আলি হতাশ হয়ে যেমন এসেছিলো ঠুকঠুক করে তেমনি ঠুকঠুক করে চলে গেলো।

তারপর একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম।

বছর কয়েক বাদে নিজেকে আবিষ্কার করলাম এসিয়াটিক সোসাইটির দপ্তরে। একজন প্রবীণ বিখ্যাত অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে প্রাচীন পুঁথিপত্র খুঁজে বের করতে হবে যেখানে যা পাওয়া যায়।

প্রথমেই মনে পড়লো কাসেম আলির কথা।

বর্ধমান-কাটোয়ার ছোট লাইনের ট্রেনে চড়ে একদিন গিয়ে হাজির হলাম।

সবাই বিস্মিত হলো। কি ব্যাপার, এতোদিন পরে?

কাজের তাগিদেই আসতে হয়েছে একথা তো ভেঙ্গে বলা যায় না। বললাম, আসতে নেই নাকি!

কাসেম আলির গ্রামটা পাশেই, বাড়িটাও চিনতাম।

একা একা চলে গেলাম একদিন।

গিয়ে দেখি ছোট একটা খড়ের চালা, সামনে বসে আছে এক থুত্থুড়ে বুড়ি।

বললাম, বুড়ি, কাসেম আলির বাড়ি ছিলো না এখানে?

বুড়ি হেসে বললে, হ্যাঁ গো কর্তা, কিন্তু সে তো কবে বেহেস্তে পলিয়েছে আমাকে ফেলে রেখে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কি? মারা গেছে কাসেম আলি?

—হ্যাঁ।

চুপ করে রইলাম। বুড়ি বললে, উঁহু মরে নি। মেরে ফেলেছিস তোরা।

একে একে সব বললে বুড়ি।

পুঁথি নকল করার নেশা নাকি বুড়ো বয়সেও ছাড়তে পারে নি কাসেম। বলতো, এখন কেউ বায়না দিচ্ছে না বটে, দেখিস আমি মরার পর এই সব নকল নেবার জন্যে কতো দাম দিতে চাইবে। পুঁথি নয় রে, এ হলো হীরে-মুক্তো।

দিনের পর দিন যেখানেই খোঁজ পেতো নকল এনে এনে বাড়িতে জমাতো কাসেম। একটা ঘর নাকি ভরে গিয়েছিলো।

বললাম, কোথায় আছে সে পুঁথিগুলো ?

হাসলো বুড়ি !

বললে, সে আমি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি।

বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন ?

বুড়ি চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে সব খুলে।

গোবিন্দপুরের দত্তবাড়িতে নাকি একটা পুঁথি ছিলো। কেউ বলতো দু'শো বছরের। কেউ বলতো পাঁচশো।

কিন্তু দত্তরা বলতো, পুঁথি নয়, ঠাকুর। সকাল বিকেল পুজো করতো, মন্ত্র পড়তো।

কাসেম আলি গিয়ে বললে, আমি নকলচি, বাবু, পুঁথিটা নকল করতে দেন।

শুনে রেগে গেলো দত্তরা। তাদের বংশের স্বপ্নে পাওয়া ঠাকুর কিনা মুসলমানে দেখবে। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলো তারা কাসেমকে।

আর কাসেমেরও নেশা চেপে গেলো, ও পুঁথি নকল করতেই হবে। না জানি কি মণিরত্ন আছে ওর ভেতর।

শেষে ঠিক করলে চুরি করে আনবে পুঁথি, নকল শেষ হলে আবার লুকিয়ে রেখে আসবে।

বুড়ি বললে, জোয়ান বয়েস হলে কথা ছিলো না। বুড়ো বয়সে কি এসব পোষায় কর্তা। গাঁয়ের এক মুসলমান ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো পুঁথি চুরি করতে। চুরি করে এনে সারারাত জেগে গাছতলায় দীপ জ্বালিয়ে নকল করলে পুঁথি। তারপর......

বুড়ির চোখ ছলছল করলো। বললে, নকল শেষ করে আবার রেখে দিয়ে আসতে গেলো ভোর রাতে। আর সঙ্গী সেই মুসলমান ছোকরাটাই ধরিয়ে দিলো লুকিয়ে বাবুদের খবর দিয়ে।

চুরিই তো নয়, মুসলমানে ছুঁয়েছে পুজোর পুঁথি। দোষ কি তাদের। তা বলে বুড়োমানুষকে কেউ এমন করে মারে।

গাঁয়ে ফিরে এসে সেই যে শয্যা নিলো কাসেম, সাতদিন জ্বরে ভুগে হঠাৎ চোখ বুজলো।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললে বুড়ি। বললে, আমারও রাগ হলো, দিলাম পুঁথির ঘরে আগুন লাগিয়ে। পুঁথিই তো কাল হলো। গোস্সা হয় না কর্তা।

সত্যি কথা বলতে কি, এমন অমূল্য সম্পদ এ ভাবে পুড়িয়ে নষ্ট করার জন্যে আমার রাগ হলো বুড়ির ওপর।

তবু বলতে পারলাম না কিছু।

ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ একজনকে জিগ্যেস করলাম, নকল্চি কাসেম আলির কবরটা কোথায় জানো?

উত্তর এলো, ঐ উধ্ববাসের পাড়ে।

খুঁজে খুঁজে গেলাম সেখানে। হ্যাঁ, কবর বলেই মনে হলো। একটা উঁচু ঢিবি, চমৎকার সবুজ ঘাস গজিয়েছে ওপরে। আর চারপাশ ছেয়ে আছে চোরকাঁটায়। এখনও কবর বলে বোঝা যায়, দু'বছর বাদে হয়তো জমির আল বলে ভুল হবে।

কাসেম আলির কথা তখন কি কেউ মনে রাখবে?

বাসুকি বসুন্ধরা

নাম জানতো না ওরা। তাই নাম একটা তৈরী করে নিয়েছিলো। বধূমাতা। কেউ-বা অপভ্রংশ করে বলতো, বৌমা। অবশ্য অন্তরঙ্গ আলোচনায়। আলাপে উল্লেখে তন্ময় হয়ে যেতো সবাই। কখনো-বা উচ্ছ্বসিত। এমন মিঠে সৌন্দর্য, মোহ জড়ানো হাসি। নিলাজ চাপল্য, অশঙ্ক চলন। দেহ আর দেহবাস সমান ছিমছাম, আভিধানিক অর্থে সত্যিকারের তন্বী। ফিতে পাড়ের ক্ষুদে ঘোমটা থাকে কি থাকে না। চকিত-চাঞ্চল্যে যখনই খসে পড়ে তখনই টেনে দেয়।

ট্রাম ডিপোর সামনেই একটা স্টপেজ। কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় ভেজা টালির ছাউনি। গুমটিঘর। নানান্ মানুষ, নানান্‌সই শাড়ি জ্যাকেটের কতো না মেয়ে। আসে যায়, থমকে থামে। কেউ ছোটাছুটি করে, কারো হয়তো প্রতীক্ষার পদচারণ। কতো লোক আসে, কতো লোক যায়। তবু চোখ পড়ে না।

সকালে, কিন্তু নটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এসে দাঁড়ায় ও। প্রতি-দিনের মতো।

আর সংযত সমস্বরে ওরা বলে ওঠে ; বধূমাতা ?

চঞ্চল হয়ে উঠি, চোখ বাড়াই। ওকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি আমিও।

গুমটিঘরের সামনে, ট্রাম লাইন আর পিচের রাস্তা পার হলেই একটা চায়ের দোকান। গুমটিঘরের মুখোমুখি। মুখোমুখিই বসে

ওরা এই দোকানটায়। আড্ডা, তর্ক, মীমাংসা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ফুটপাথের পথচারী আর অপেক্ষমানা ট্রাম-যাত্রিণীদের সম্বন্ধে দু'চারটে টীকাটিপ্পনী। হাসাহাসি, রসিকতা নিজেদের মধ্যেই। লঘু-দৃষ্টি ছুঁড়ে দেয় সকলের দিকেই। সিনেমার ছবির মতো প্রতি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, মুছে যায় মন থেকে। সমস্ত দিনের মধ্যে শুধু একটি আনন্দঘন মুহূর্ত। নটা পঁয়ত্রিশ মিনিট। এ ছবি মোছে না, এ ছাপ স্পষ্ট।

এতোদিন শুনেই আসছি ওদের কাছে। ওদের উদ্‌ভ্রান্ত বর্ণনায় বধূমাতার ছবি এঁকে নিয়েছিলাম নিজের মনে। এতদিনে সুযোগ ঘটলো। দেখলাম চোখ চেয়ে, নিজের চোখে দেখলাম।

না, মুখটা তখনও দেখতে পাইনি। ছোটখাটো হাল্কা চেহারা, সাদা ধবধবে শাড়ির প্রান্তে ইঞ্চিখানেক চওড়া রূপোলী পাড়, ভেল-ভেটের মতো পালিশ করা। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা গাঢ় নীল রঙের চামড়ার ব্যাগ। বাঁ হাতে ঝুলছে পাট করা আসমানী রঙের ওয়াটারপ্রুফ। ফিকে নীল, গাঢ় নীল। ছোঁয়া লেগে কিংবা ছায়া লেগে রূপোলী পাড়েও কেমন একটা নীলাভা। চোখের তারাতেও হয়তো দেখা যেতো।

কিন্তু মুখ দেখিনি তখনও। চোখ দেখতে পাইনি।

খুটখুট করে হাল্কা পায়ে এগিয়ে এলো ও। গ্রীশিয়ান মূর্তির পায়ে যেমন দেখা যায় তেমনি লাল সবুজ সাদার রঙ মেশানো স্ট্র্যাপবাঁধা স্যাণ্ডেল ওর পায়ে। একটু খাপছাড়া, একটু বেশী উজ্জ্বল। হয়তো চোখকে পায়ে নোয়াবার জন্যেই। কে জানে। কিন্তু, প্রয়োজন হয়তো ছিলো না। চোখ এমনিই শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে।

—সহেলী? কী ভাষায় কথা বলছিস্? ওরা প্রশ্ন করে।

অভিভূত ভাবটা কেটে যায়।

টালির ছাউনিটার নিচে এসে দাঁড়িয়েছিলো ও। ট্রামের অপেক্ষায়। মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলাম ওকে, স্পষ্ট চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই অজান্তে মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে পড়েছিলো একটি শব্দ।

—সহেলী।

ওকে এভাবে দেখবো, এতোদিন পরে, ভাবতেই পারিনি।

চেয়ার ছেড়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম। একটু সন্দেহ। ভুল হয়নি তো? না, এ মুখ ভুল হবার নয়, ভোলবার নয়।

ওর চোখ তখন অনেক দূরে! ট্রাম লাইনের সমতলে মিশে আছে বুঝিবা। ট্রামের আভাস পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।

সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। ডাকলাম।—অনুরাধা!

চমকে চোখ ফেরালো ও। বিস্মিত হলো। হয়তো চিনতে পারেনি প্রথম দৃষ্টিতে। পরক্ষণেই পাহাড়-ভাঙা ঝর্ণার মতো, উচ্ছল আর সহজ হাসি। চকচক করে উঠলো ওর চোখের তারা। অনুভব করলাম, আমার দু কাঁধের ওপর দুটি নরম হাতের ঝাঁকানি।

—তুমি? চয়নদা তুমি?

ওয়াটারপ্রুফটা ওর হাত থেকে খসে পড়েছিলো, কুড়িয়ে তুলে দিলাম ওর হাতে। তাকিয়ে দেখলাম ভালো করে। খুশিতে ওর মুখ সহাস, চোখ সজল। তরল হীরের মতো দুটো বিন্দু ফুটে উঠলো ওর চোখে।

বললাম, খুব রোগা হয়ে গেছিস্।

—তাই বুঝি? খুব বিচ্ছিরি দেখতে হয়েছি, না? সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলে।

বললাম, না। রোগা হয়েছিস্, কিন্তু অনেক সুন্দরও।

ঠোঁট টিপে লাজুক হাসি হাসলে ও। তবু যেন বিশ্বাস করলে না। জিজ্ঞেস করলে, সত্যি?

ঘাড় কাত করে জবাব দিলাম। বললাম, তারপর? কি খবর তোদের?

আঙুলে আঙুল জড়ালে ও।—উঃ, কদ্দিন পরে দেখা বলোতো? কি খবর বলবো, কোন খবরই তো জানো না।

বললাম, কাজের তাড়া আছে বুঝি? থাক্ তবে, পরে শুনবো।

অনুরাধা বাধা দিলো।—মরুক গে কাজ। চলো, অনেক, অনেক কথা আছে। তোমার খবরও তো কিছু জানি না ছাই। কি করছো, চাকরিবাকরি? বিয়ে করেছো? চলো, কোথায় যাই বলো তো? কোথাও বসিগে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা বলা যায়।

কোথায় যাওয়া যায় ভাবলাম। খুঁজে পেলাম না। ও-ই হদিস দিলে শেষকালে।

বললে, পার্কের ঐ বেঞ্চিটা খালি আছে।

আমার সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করলে না। পা বাড়ালে পার্কের দিকে। পাশে পাশে আমিও এলাম। এসে বসলাম বেঞ্চিটায়।

বর্ষাতিটা ধুপ করে ফেললে একপাশে, কাঁধের ব্যাগটাও খুলে রাখলে কোলের ওপর। চোখে চোখ রেখে বললে, তারপর? তোমার কথা আগে শুনি।

শোনাবার কথা শোনালাম।

কাদা-মাখা কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছে, সেদিকে উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো ও। শুনলো আমার সব কথা।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাসগুলো ভিজে ভিজে। শিরীষ গাছটা থেকে টুপটুপ করে মোটা মোটা জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। ফিকে হলুদ রোদের আভাস দেখা দিলো আকাশে।

আরো সুন্দর দেখালো অনুরাধাকে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে

রইলাম ওর সুডৌল হাতদুটোর দিকে, সরু সরু লম্বা আঙুলগুলোর দিকে। একটু যেন বিচলিত, একটু বা চঞ্চল মনে হলো।

হঠাৎ প্রশ্ন করলে আবার।—তবু, বিয়ে করলে না কেন?

হাসলাম।—এই বাজার, আর এই রোজগারে?

—দুঃখকষ্ট তো আছেই। তা বলে সরে পালাবে? তুমিও শেষে একথা বলবে চন্দনদা?

উত্তর দিতে পারলাম না। কি উত্তর দেবো? বললাম, তোর খবর বল্, কিছুইতো বললি না।

খবর? খিলখিল করে হেসে উঠলো অনুরাধা।—খবর নয় চন্দনদা, রীতিমত উপন্যাস। লেখো না তুমি, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারো না? ছেড়ে দিয়েছো বুঝি?

বললাম, আগে শুনি তো।

বলতে শুরু করলো ও। উপন্যাসই। রীতিমত একটা কাহিনী।

কে জানতো আবার মনে পড়বে, আবার দেখা হবে অনুরাধার সঙ্গে। সহেলীর সঙ্গে। কংসবতীর পাড়ে মেঁঠো ময়না আর গাংশালিকের বাসা। তার পাশেই নতুন জাগা উপনিবাস। আরো দূরে, মাইল পাঁচেক ব্যবধানে তখন গড়ে উঠছে নতুন শহর, রেল কলোনীর উপনিবেশ। আর সেই দূর শহরে জল জোগাবার জন্যে এই স্টেশন, সপ্তকূপ ওয়াটার-ওয়ার্কস। খান সাত-আট কোয়ার্টার —টালির ছাদ, এক-ইঁটের দেয়াল। সঙ্গে বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা ছোট-ছুটকো বাগান। কলার ঝোপ আর কুমড়োর ফুল। এটা ওটা।

পাশাপাশি থাকতাম আমরা। কতই বা বয়েস তখন। বারো তেরো বছরও নয়। দেখাতো আরো ছোট। বেঁটেখাটো চেহারা ছিলো আমার, তার ওপর করমচার মতো কচি আর গোলাপী মুখ। শুনেছি তো নিশ্চয়ই, অনেকের কাছে, তাছাড়া আয়নাতেও দেখতে পেতাম।

না, শুধু তাই নয়। লাজুকও ছিলাম একটু বেশিবেশি। বন্ধু ছিলো শুধু অনুরাধা। ভালো লাগতো অনুরাধাকেই। মিশতামও ওরই সঙ্গে।

আধো আধো আদুরে কথা, চন্নদা, চন্নদা।

'চন্দন' বেরুতো না ওর মুখ দিয়ে। অথচ বয়েস ছিল প্রায় সমবয়েসী।

ভোর হয়তো তখনও হয়নি। আবছা আবছা অন্ধকার জমে রয়েছে গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায়। কাশঝোপ আর শরবনে হয়তো ফিকে রূপোলী আলোর চমক দেখা দিয়েছে। অমনি দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

জাফ্রির ফাঁকে মুখ রেখে, চন্নদা চন্নদা।

বিহারী চাকর ছিলো মঙ্গল। সে-ই ডেকে তুলতো আমাকে।

—খোকাবাবু, এ খোকাবাবু, সহেলী বুলা রহি। মঙ্গল চেঁচিয়ে বলতো।

জিজ্ঞেস করতাম, সহেলী আবার কি? সহেলী বলিস কেন, ও-তো অনু, অনুরাধা।

মঙ্গল হাসতো, বোঝাবার চেষ্টা করতো 'সহেলী' শব্দের অর্থ। বুঝতাম না।

দিদিকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। খুব ভালো হিন্দী জানতো দিদি।

বললে, 'সহেলী' জানিস না, সহেলী মানে 'সই'।

অনুরাধা তো হেসে লুটোপুটি।—ওমা, ছেলেমেয়ে আবার সই হয় নাকি? সই তো মেয়েতে মেয়েতে হয়। না বাপু, তার চেয়ে মাস্টারমশায় বলবো আমি। কি সুন্দর অঙ্ক বুঝিয়ে দেয় চন্নদা।

ছেঁড়া ময়লা, ছোপ ছোপ কালি লাগানো খাতাটা বের করে মাদুরের ওপর বসতো ও। শুরু হতো পড়াশুনোর ভান। তারপর

আড়চোখে তাকাতে তাকাতে এক ফাঁকে সুড়ুৎ করে দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে।

এমনি করে চলছিলো জনবিরল আধা-শহরে জীবন। বয়স যে বাড়ছে টের পাইনি।

হঠাৎ একদিন বাড়তি বয়সের একজনকে দেখলাম।

ছেলের নাম নয়নমণি। হো হো করে হেসেছিলাম দু'জনেই। আর কি চেহারার ছিরি। প্যাঁকাটির মত লম্বা আর রোগা। শুধু কালো নয়, জমকালো। অনুরাধা হেসে বলেছিলো, উঁহু জমকালো, যমের মত কালো। খিল্ খিল্ করে হেসে লুটিয়ে পড়তো ও নয়নমণির কথা উঠলেই।

নতুন ওভারসিয়ার বদ্‌লি হয়ে এসেছেন, তাঁরই ছেলে।

বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি সেদিন। বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ভেলভেটের মতো নরম আর লাল পোকা। শিশিতে সিঁদুর আর ঘাস রেখে তার ভেতর ভরে রাখতাম। কখনো-সখনো হাতের পাতায় নিয়ে মন্ত্র আওড়াতাম। এমনিতে কুঁকড়ে পড়ে থাকে, আর ছড়া কাটা শেষ না হতেই সুড় সুড় করে চলতে শুরু করে। এই সিঁদুরে মখমলের বীরবাবটি খুঁজতে বেরিয়েছি দু'জনে।

পোর্টারখুলি, অর্থাৎ কুলী-খালাসীদের লাইনবন্দী নোওরা খুপরির সারি পার হয়ে এসে পড়লাম টুক্‌রো একফালি ধেনো জমির ওপর। মাঠে মাঠে কাটা ধানের গেঁড়ো, পায়ে লাগে পথ চলতে। আঁকা-বাঁকা আল ধরে চলতে গেলেও পা পিছলে পড়ে ভিজে মাটির কাদায়।

রেল লাইনের পাশে পাশে বিছানো আছে দুর্বাঘাসের সবুজ গালিচা। অনুরাধার নির্দেশে সেই পথই ধরতে হলো। অনেক ঘোরাঘুরির পর ব্যর্থ মনে আর ক্লান্ত পায়ে ফিরছি তখন।

ঘড়ির কাঁটায় রাত বেজে গেলো। তবু অন্ধকার তেমন ঘন হলো

না। কোন শুক্ল তিথির চাঁদ-ঝরা জ্বলোয় হয়তো মৌননিশীথ মাটিতে মুখ লুকিয়ে রইলো। শরমে সম্ভ্রমে।

মিষ্টি মিষ্টি জ্যোৎস্না, গাছ আর পাতার ভাঙা ভাঙা ছায়া। দূরের অন্ধকারে স্টেশনঘর আর ওয়াটার ওয়ার্কসের খুচরো আলোর জোনাকি।

দ্রুত পায়ে ফিরছিলাম। দু'জনে। দু'জনেই থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন বাঁশী বাজাচ্ছে। মন উজাড় করা কাঁপা কাঁপা সুর। করুণ কান্নার রেশ যেন। বোবা বাঁশীর মুখে এতো স্পষ্ট কাকলী শুনিনি। পাইনি মন ছোঁয়া এ গানের আবেশ।

রেল লাইনের তলা দিয়ে গেছে একটা ক্যানালের নালা। পোলের পাশেই সিমেন্টে বাঁধানো কালভার্ট। আর তার ওপর বসে আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছে, সিল্যুট শরীর একটি পুরুষ। নয়নমণি।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন। অনু, অনুরাধা তখন অবধি একটাও কথা বলেনি।

বললাম, কিরে, কথা বলছিস না যে?

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো ও।—কালোমানিক বেশ বাঁশী বাজায় কিন্তু, না চন্নদা?

ওর হাসিতে বিদ্রূপ ছিলো, প্রশংসা নয়। তবু ভালো লাগলো না। এ যেন আমার অধিকারের ওপর অন্য কারো অকারণ হস্তক্ষেপ। মনে মনে চটে গেলাম নয়নমণির ওপর।

নয়নমণি আর অনুরাধার মাঝে যতো উঁচু আর যতো বড় সম্ভব পাঁচিল গাঁথলাম। কিন্তু, ফল হলো না। লুকিয়ে লুকিয়ে নয়নমণির গান শুনতে যেতো ও, বাঁশী শিখতে। ওর মা আপত্তি করতেন, মেয়েছেলের আবার বাঁশী বাজানো কি? আমি নিষেধ করতাম। শুনতো না।

তবু, রোজ এসে বলতো নয়নমণির কথা।—কালোমানিক

যখন মাথা ছুলিয়ে ছুলিয়ে গান গায় 'চন্নদা'···হেসে লুটিয়ে পড়তো ও।

আমার সাম্‌নেই একদিন সরল সহজ মেয়েটির মত বোকা বোকা চোখে বললে, নয়নদা, তুমি বুঝি আলকাতরার কারখানায় কাজ করতে ?

বেচারীর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেলো, অথচ এতটুকু দয়া দেখালে না অনু। ওর সাম্‌নেই হেসে লুটোপুটি খেলো।

এমনিভাবেই চলছিলো দিন, বছর কাটছিলো।

কোলকাতায় এলাম কলেজে পড়তে। দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হলো। তবু চিঠিপত্র লিখতাম মাঝে মাঝে। কবিতা লিখতাম, লিখে পাঠাতাম ওকে। গান জানি না, বাঁশী বাজাতে পারি না, তবু আরেকটা গুণ তো আমার আছে। অনুরাধাও লিখতো চিঠি, যার একখানাও যদি নয়নমণি পড়তো তো আত্মহত্যা করতো সে। তবু ঈর্ষা দূর হতো না মন থেকে।

হঠাৎ আমাদের পত্রালাপে যতি পড়লো। খবর শুনলাম। অনুরাধাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের ছুটিতে ফিরে এলাম। শুনলাম, আরো একজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। নয়নমণি ?

—শেষকালে কালোমানিকের সঙ্গে পালাবো তুমি বোধ হয় ভাবতেই পারোনি, না চন্নদা ? খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো অনুরাধা, যেন কতো বড়ো একটা রসিকতা।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। সহেলী, অনুরাধা। সেদিনের সেই সহজ সারল্য, আজকের এই আনন্দ উজ্জ্বল মুখ। এ মুখে যেন কথাগুলো বেখাপ্পা শোনালো।

বললাম, এখনো কালোমানিক বলিস নাকি ? সিঁথির সিঁদুরের রেখাটার দিকে চকিতে চোখ ফেলে বললাম, স্বামী না তোর ?

সশব্দে হেসে উঠলো ও। পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ ছায়া নামলো ওর চোখে।

—তখন আর না পালিয়ে উপায় ছিলো না, তাই। তাছাড়া, কালো—, ফিকে হাসি হেসে বললে, তোমার আবার আপত্তি আছে বুঝি, তা নয়নদা কিন্তু সত্যি বড়ো বোকা, বড়ো বেশি ভালোবাসতো আমাকে, বিশ্বাস করতো।

বললাম, পুরুষরা যখন ভালোবাসে তখন বিশ্বাসও করে।

নীল চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো ও। জীপ ফাস্‌নারটা একবার খুলছিল, আবার বন্ধ করছিল।

হঠাৎ ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের করে বললে, কেমন দেখতে বলো।

একটি সুন্দরকান্তি পুরুষের ছবি। বললাম, সুন্দর নিশ্চয়ই।

—আমার স্বামী। হাসলো ও।

চট্‌ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো আমার বিস্মিত মুখের ওপর।

বললে, নয়নদার গান আমাকে ভুলিয়ে ছিলো, ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু, কি জানো চন্নদা, তোমার সেই কবিতা লেখা কিংবা নয়নদার গান এসব হলো খ্যাতির জন্যে। নাম করবে পাঁচজনে। যেমন ধরো পরীক্ষায় পাশ করা বা ব্যবসাদারী বুদ্ধি থাকা, এসব হলো টাকা রোজগারের জন্যে। তেমনি রূপ বা সৌন্দর্য না থাকলে ভালোবাসা যায় না।

বললাম, এসব জ্ঞান কবে থেকে হলো ?

মুখটা ফ্যাকাশে হলো যেন ওর, আমার কথায় ঠাট্টার সুরটা ধরতে পেরেই হয়তো। খানিক মাথা নীচু করে চুপ করে রইলো ও, তারপর আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট আর শান্ত গলায় বললে, ছেলেটা মারা গেলো হাসপাতালে। এদিকে নয়নদার রোজগারও

ছিলো কম, তাই টাইপ ইস্কুলে ভর্তি হলাম। এমনিতেই ওকে সাহায্য করতে পারতাম না, টাইপটা শিখে নিয়ে যখন বুঝলাম চাকরি বাকরি একটা চেষ্টা করলেই পাবো, তখন একদিন হঠাৎ উধাও হলাম। একেবারে কোলকাতা।

চমকে উঠলাম। বলে কি ?

ও হাসলে।—কখনো কিছুতে ভয় পেতে দেখেছো আমাকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

ও আবার হেসে উঠলো।—তারপর আপিসেরই একজন, মিঃ আয়ার, বিয়ে করতে চাইলেন। রাজি হয়ে গেলাম। ফটো তো দেখলে, কি সুন্দর নয় চেহারাটা ?

একটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হলো, নয়নমণির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিলো কিনা। কিন্তু মুখে এলো না। কেমন বাধো বাধো ঠেকলো। শুধু বললাম, বাঙ্গালী নন ? চেহারা দেখে তো বাঙ্গালীই ভেবেছিলাম !

লাজুক হাসি হাসলে অনু।—আজকাল বেশ বাঙলা বলতে পারে। শিখে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম দু'জনে।

বললাম, সুখেই আছিস তা হলে। সুখে থাকবি তাই চেয়েছিলাম।

কথাটা শুনলো না ও, কিংবা শুনতে পেলো না। হঠাৎ বললে, একটা কাজ করবে চন্নদা ?

—কি ?

অনুরাধার চোখজোড়া যেন চকচক করে উঠলো।—নয়নদা যাদবপুরে আছে, হাসপাতালে। টি বি-তে ভুগছে।......যাও না একদিন, দেখা করে এসো। পুরোনো লোক দেখলে একটু শান্তি পাবে হয়তো।

বিস্ময় চাপা দিয়ে ঠিকানাটা জেনে নিলাম। -যাবো একদিন।

—আমার ঠিকানাটাও রাখো। এক টুকরো কাগজে লিখে দিলে ও। বললে, যে কোনোদিন সন্ধ্যে সাতটার পর। আসবে তো?

সম্মতি জানালাম।

ট্রামে উঠতে উঠতে, বললে, রোববারেও তো আসতে পারো। যখন হোক্।

ঘাড় নেড়ে বললাম, যাবো।

সত্যি বলতে কি, অনুরাধার ঐ কমনীয় রূপ, ওর হাসির নির্মলিন নির্ঝর আমার মনের কোণে নূপুর বাজিয়ে গিয়েছিলো সেদিন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও, সে ঘুঙুরের বোল বুলবুলির সুরের মতই ছন্দোময় আর স্পষ্ট। তবু খুশি হতে পারিনি। উপন্যাস বুনতে বলেছিলো অনুরাধা, ওর জীবনের কাহিনীকে ঘিরে। অথচ আমার মনে হয়েছিলো, ওর জীবনের বৃত্ত থেকে গড়ে উঠতে পারে শুধু অপন্যাস।

অর্থাৎ, মনে মনে ক্ষমা করতে পারিনি ওকে।

কিন্তু, ওর হাসিতে বুঝি মোহ ছিলো, চটুল চোখের চাউনিতে কোনো নেশার আমেজ। আর ভোরবিহঙ্গের কণ্ঠকাকলী ওর গলার স্বরে।

তাই, সত্যি একদিন গিয়ে হাজির হলাম ওর বাসায়, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে।

গলিটা কানা আর নোংরা। একটা ডাস্টবিন বাড়ির সামনে। পচা ভাত, কলার পাতা। চিংড়ির খোসা, মরা ইঁদুর, ভাঙা হাঁড়ি আর সরা। সবে মিলে গলিটাকে নোংরাই করে তোলেনি, কিছুটা বীভৎসও। আর বাড়িটাও পুরোনো। ভাঙা ছাদের জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে দেওয়ালের ইঁট অবধি ক্ষয়ে গেছে। তারই ভেতর, এক কোণের দু'খানি ঘর।

তবু পরিচ্ছন্ন। সাজানো গোছানো।

একটা ডেক চেয়ারে শুয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত্ আয়ার। অনুরাধা আলাপ করিয়ে দিলো।

দুটো হাত তুলে নমস্কার করবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। বছর চারেক হলো জীবনের রস হারিয়ে ফেলেছেন, গাঢ় দুঃখের স্বরে বললেন কৃষ্ণকান্ত্। দেহের বাঁ দিকটা প্যারালিসিসে পড়ে গেছে।

আমার নাম বলে আলাপ করিয়ে দিলে অনু।—আমার ছোটবেলাকার বন্ধু।

কৃষ্ণকান্ত্ হাসলেন।—আপনার নাম রাধার মুখে আমি শুনিনি কিন্তু কখনও।

বছর আট ন'য়ের একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে, আর দুটি ছেলে। সামনে এনে হাজির করলে অনুরাধা। বললে, প্রণাম করো। মামা হন।

ওরা প্রণাম করলো এক কথায়। কাছে টেনে নিলাম একজনকে।

আর কৃষ্ণকান্তের সঙ্গে গল্প করতে করতে লক্ষ্য করলাম অনুরাধাকে। কি চঞ্চল আর কি তৎপর। এই কি স্বাভাবিক রূপ ? সত্যি, আশ্চর্য হলাম।

সাদাসিধে একটা লালপাড় শাড়ি। আলুথালু চুল। অতি ব্যস্ততায় কপালে ঘাম, কপোলে রক্তিমাভা। এক ফাঁকে এসে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে গেল, ময়লা কাপড় গুছিয়ে রাখলে আলনায়। আবার তখনই ছুটলো, যাই উনুনটা ধরলো কিনা দেখি।

মেয়ের ফ্রক পাল্টে দিলে, চিবুক ধরে চুল আঁচড়ে দিলে। ফ্রকটা দেখিয়ে বললে, নিজের হাতে করেছি, কেমন হয়েছে বলো তো চন্দনদা ?

আমি কিছু বলবার আগেই জুড়ে দিলে, নিজের হাতে সেলাই কিন্তু, মেসিনে নয়। হানিকুম্বটা ভালো হয়নি?

কবরেজি তেলটা নিয়ে এসে কৃষ্ণকান্তের হাতেপায়ে মালিশ করতে করতে গল্প শুরু করলে আবার।

কৃষ্ণকান্ত্ অপাঙ্গে হাসলেন।—রাধার মত মেয়ে কিন্তু আপনি আর একটিও পাবেন না। ইউ হ্যাভ মিস্‌ড হার, মিস্‌ড এন আইডিয়েল্ ওয়াইফ। ছোটোবেলাতেই যখন অপারচুনিটি পেয়েছিলেন……

অনুরাধার চোখে কপট ভর্ৎসনা।

না হেসে পারলাম না।

কৃষ্ণকান্ত্ হেসে বললেন, হাসি নয়। চার বচ্ছর পড়ে আছি প্যারালিসিসে, একটা পয়সা রোজগার নেই। অ্যাণ্ড দি হোল বার্ডেন ইজ অন রাধা।

বাকীটা শুনলাম অনুরাধার কাছে, বললে, কি আর এমন শক্ত কাজ। চাকরি তো দশটা পাঁচটা। সকালে এক ঘণ্টা একটি মেয়েকে সেলাই শেখাই, রাত্রে দু'ঘণ্টা গানের মাস্টারী।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বললে, দোহাই তোমার, গল্পটল্প লেখো কিনা জানি না। লিখলে, আর সকলের মতো সেই একই গল্প লিখো না। বিশ্বাস করো, কাজ করেও রুগ্ন স্বামীর সেবা করা যায়, সংসার খরচের টাকা, ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পড়ানো—এসব ভার নেয়াও অসম্ভব নয় মেয়েদের পক্ষে।

চলে আসছিলাম। ও আবার ডাকলে।

—যাবে নাকি একদিন, নয়নদাকে দেখতে।

বললাম, যাবো তো নিশ্চয়ই। তুইও চল না সঙ্গে।

ও বিব্রত হয়ে উঠলো।—না, না। ছিঃ, তাই কি চলে। ভালোও দেখায় না, উচিতও নয়।

ইচ্ছে হয়তো সত্যিই ছিলো না। তবু একদিন গেলাম হাসপাতালে, নয়নমণিকে দেখতে।

কলার ঝোপ আর জলো নালার পচানি, এরই মাঝ দিয়ে গেছে ভাঙ্গাচোরা কাঁচা রাস্তা। আর মটরবাসে তেমনি ভিড়। তবু গেলাম। দেখতে, দেখা করতে।

. দেখলাম শহরতলীর অপরূপ সায়াহ্ন। শান্তি। নিম আর নাক্সভোমিকার ছায়া, মাঝে মাঝে জাহাজের মাস্তলের মতো দীর্ঘ মসৃণ ইউক্যালিপটাসের সাদা গুঁড়ির পরিচ্ছন্নতা। আড়ালে লুকানো ছায়ায় ভেজা হাসপাতাল। ঠাণ্ডা, শান্ত, নিঃশব্দ। বরফের দেশের মতো, বরফের ঘরের মতো। চুপচাপ। ফিসফিস। সূর্যের তেজ নেই, শব্দের তীক্ষ্ণতা নেই।

বারো-দরোজার লম্বা লম্বা ঘর পার হয়ে ওয়ার্ড খুঁজে পেলাম। বেড নম্বর সতেরো। ঠাণ্ডা, নিঃঝুম। সমস্ত ঘরখানায় সারি সারি, সরু সরু লোহার খাট। ধবধবে ফর্সা চাদরে ঢাকা। দেয়ালের গায়ে, বিছানা বালিশের শুভ্রতায়, কর্মচঞ্চল নার্সের বসনেভূষণে মহাশান্তির শ্বেতাভা যেন। কেমন এক করুণা-কোমল আবহাওয়া সারা ঘরের বাতাসে।

শুয়ে শুয়ে পড়ছিলো নয়নমণি! নার্স একটা টুল টেনে দিলো ওর পায়ের কাছে। বসতে বললে আমাকে সহাস অনুরোধে। নয়নমণি বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালে আমার দিকে। বিস্মিত হলো। দোষ কি ওর, চিনতে না পারারই কথা।

সব শুনে ম্লান হাসিতে উজ্জ্বল হবার চেষ্টা করলে ও।

দু'তিনখানা ঘরের ওপার থেকে কার ভাঙ্গা গলার কাশির শব্দ আসছে আর নার্সের জুতোর খুটখুট খুটখুট শব্দ। চঞ্চল পায়ে ঘোরাফেরা করছে সারা ঘরময়। আরো কারা যেন অন্য অন্য রুগীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

হাতের বইটা বুকের ওপর রেখে নয়নমণি বললে, অনেক বড়ো হয়েছো, মাথাতেও লম্বা হয়েছো অনেকটা, তাই চিনতে পারিনি প্রথমে।

বললাম, অনুরাধাও প্রথমে চিনতে পারেনি। ওর কাছেই খবর পেলাম আপনার। খবর পেলাম বলবো না, ও-ই একরকম জোর করে পাঠালো আমাকে।

নয়নমণিকে আমি কোনোদিন পছন্দ করিনি। কেন জানি না, মন বলতো ও আমার শত্রু। তবু, ওর দুঃখ ওর ব্যথা-বেদনার ছোঁয়া পেলাম যেন। এই অসহায় রোগশয্যা। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাওয়া, প্রবঞ্চনার গভীর ক্ষত, অনুরাধার ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রতারণা। হঠাৎ কেমন যেন বড়ো আপনার জন বলে মনে হলো নয়নমণিকে। বড়ো অন্তরঙ্গ মনে হলো।

ওকে খুশি করবার জন্যেই হয়তো বললাম, অনু প্রায়ই আপনার কথা বলে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে ও।—একটা দিন, কয়েক মিনিটের জন্যেও কি ও দেখা দিতে পারে না একবার। বড়ো দেখতে ইচ্ছে হয়। কতো কথা বলবার ছিলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি।

আশ্চর্য। একবারও ভাবিনি, এক মুহূর্তের জন্যেও মনে হয়নি যে অনুরাধা আমাকে আসতে বলেছে বারবার, অথচ নিজে একদিনের জন্যেও আসেনি, দেখতে বা দেখা দিতে। মনটা বিষিয়ে উঠলো অনুরাধার ওপর। মনে হলো, নয়নমণির এ অবস্থার জন্যে অনুরাধাই দায়ী, একমাত্র অনুরাধাই দায়ী।

তবু বললাম, সকাল বিকেল মাস্টারী করা, দুপুরে চাকরি, তার ওপর ঘর-সংসার দেখা-শোনা। সময় পায় না বেচারী।

আবার একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে নয়নমণি। বড় বেশি

ফ্যাকাশে দেখালো ওর মুখখানা। চোখের তারা দু'টো যেন জ্যোতি হারিয়েছে। সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে শুয়ে রইলো চুপ করে।

তারপর হঠাৎ বললো, বাঁচবো না আর বেশিদিন। আর বেঁচে থেকে মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া।

বুঝলাম না কথাটা। চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে, সারাটা জীবন শুধু ওকে দুঃখই দিলাম। জানো ভাই চন্দন, অনুরাধার মত মেয়ে আর একটাও দেখতে পাবে না। এতো ভালো মেয়ে, এতো সাহস আর ধৈর্য।

বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

নয়নমণি হাসলো।—কেউ জানলো না, শুনলো না। চন্দন ভাই, তুমি অন্তত জেনে রাখো, অনু সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক ওপরে ও। প্রথম যেদিন আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠলো সেদিন একটা পয়সা রোজগার নেই আমার। এক হপ্তা পরেই অনুও হলো নিরুদ্দেশ। ভেবেছিলাম, রোগের ভয়ে বুঝি পালিয়েছে। সশব্দে হেসে উঠলো নয়নমণি।

অনুরাধার কথাটা মনে পড়লো।—রূপ না থাকলে কি ভালোবাসা যায়, চন্দনদা।

নয়নমণি বললে, আরো অনেক কিছু ভেবেছিলাম সেদিন। অথচ আমাকে বাঁচাবার জন্যেই চলে এসেছিলো ও। চাকরি করে টাকা রোজগার করবার জন্যে, ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আমার চিকিৎসা করাবার জন্যে।

এক তাড়া চিঠি বের করলে নয়নমণি, বিছানার নীচে থেকে।

—এই যে, এই চিঠিটা পড়ো, অনুরাধা লিখেছিলো।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে গেলাম, পড়া হলো না। নয়নমণির কথা শোনবার জন্যে সমস্ত মন তখন উদগ্রীব।

—অনেক চেষ্টায় বেড জোগাড় করলে, পেণ্ড্রা রোড থেকে

আনলে এখানে। এই রাজসিক রোগ, জানো তো কতো খরচ, সব খরচ চালিয়ে এসেছে অনু, অনুরাধা। গত হপ্তাতেও চিঠি দিয়েছে, আমি ভালো হয়ে গেছি, ও নাকি স্বপ্নে দেখেছে।

হেসে উঠলো নয়নমণি।—বোকা মেয়ে, এতো সরল বিশ্বাস ওর। আমি আবার ভালো হবো, আমি আবার ফিরে যাবো! কিন্তু ও আসে না কেন একদিন, একবার কি দেখা করতে পারে না?

বললাম, আমি ফিরে গিয়ে বলবো, নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো একদিন।

নয়নমণি ম্লান হয়ে গেলো হঠাৎ। না, না, ও আসবে না। আসবে না ও।

বাধা দিলাম না। প্রতিশ্রুতি দিলাম না। হয়তো সত্যিই আসবে না অনুরাধা।

আরো কিছুক্ষণ কাটালাম। সেই ছোটবেলাকার কতো কথা, কতো গল্প। এক সময় উঠে এলাম বিদায় নিয়ে। বেরিয়ে এলাম।

অনুরাধাকে এসে বললাম, অনেকগুলো প্রশ্ন আছে, জবাব দাও।

কেন জানি না, ওকে আর আগের মতো 'তুই' সম্বোধন করতে বাধলো।

ও হাসলো।—বলো কি তোমার প্রশ্ন।

—নয়নমণিকে তুমি সত্যি ভালোবাসতে, ভালোবাসো। তবু, একটা দিনের জন্যেও কেন দেখা করতে যাওনি? তোমাকে দেখলে ও হয়তো কিছুটা শান্তি পেতো। আরাম পেতো।

অনুরাধা হেসে উঠলো।—ভালোবাসতাম? ভালোবাসি? খিলখিল করে হেসে উঠলো ও আবার।—কালোমানিকের বুঝি তাই ধারণা?

রাগ হলো, বিরক্তিও বোধ করলাম। বুঝলাম, উত্তর ও দেবে না এ প্রশ্নের।

বললাম, আরেকটা প্রশ্ন, কৃষ্ণকান্তকে তুমি বিয়ে করলে কেন?

—বিয়ে না করে জীবনটা নষ্ট করলেই বুঝি ভালো হতো?

অতিষ্ঠ হয়ে বললাম, একটা কথা বলো, তুমি কাকে ভালোবাসতে, ভালোবাসো? নয়নমণি না কৃষ্ণকান্ত্। না কি দু'জনকেই?

আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো অনুরাধা।—যদি বলি তোমাকে?

এতো রাগেও হাসি পেলো। বললাম, তা হলে নয়নমণিকে সারিয়ে তোলার জন্মে রক্ত জল করতে না, আর প্যারালিটিক কৃষ্ণকান্তের সংসারেও মায়া থাকতো না তোমার।

কোন উত্তর দিলো না অনুরাধা। চকিতে একবার তাকালো আমার মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই চলে গেলো চা তৈরী করতে। যখন ফিরে এলো, মনে হলো, চোখেমুখে যেন জলের ঝাপটা দিয়ে এসেছে ও।

ঝড়

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

গুঞ্জনের মতো দ্রুতগতিতে রটে গেলো খবরটা।

সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। শাড়ির খসখসানি, কঙ্কণের কাঁপন আর চুড়ির চূর্ণ শব্দে ঘরের বাতাস যেন চমকে উঠলো। প্রসাধিত সুন্দর মুখের ওপর আশা-আশঙ্কার ছাপ পড়লো, চোখে নামলো ঔৎসুক্যের ঔজ্জ্বল্য।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ আসবে বলেই আজকের এই বিশিষ্ট পরিচ্ছন্নতা, এই রঙের বৈচিত্র্য, এই আলোর উক্তি।

অসংখ্য মেয়ে, আর অজস্র তাদের টুকরো টুকরো মিষ্টি কথালাপের কাকলীতে ঘরের চেরাগও চঞ্চল।

আলোয় আলোকিত সারা ঘর।

ছোটো ছোটো টেবিল আর চেয়ার পড়েছে অনেকগুলি।

এখানে ওখানে সুগন্ধি এসেন্সের আমেজ।

খুট-খুট করে উঁচু হিল জুতোর ছন্দ বাজিয়ে চায়ের ট্রে হাতে ঘুরে বেড়ায় এ ও সে। শাড়ির আঁচল ঠিক করে কেউ। রঙিন রুমালে ঘাম মোছে কাঁধ আর বুকের। কেউ বা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করে ক্ষুদে আয়না আর রাঙির চাকতি। ঠোঁটের লালিমা কি উজ্জ্বল আছে?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ না এলে আজকের এই চায়ের আসর মাটি হয়ে যাবে যে ?

সমীরণকে ঘিরেই তো এই অজস্রতা, এই আতিশয্য, এই চঞ্চল উদ্দীপনা। এখানে আর ওখানে আর সেখানে। এ-পাড়ার আর ও-পাড়ার আর বে-পাড়ার যত পরিচিত মেয়ের দল এসে জুটেছে আজ এই চায়ের আসরে। শুধু কি মেয়েরাই ? না, দু'চার জন পুরুষও এসেছে তাদের গৃহিণীদের সঙ্গে। এসেছে বন্ধু আর বন্ধুভ্রাতার দল। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প তাই তাদের মুখগুলো চোখে পড়ছে না। সাবানের ফেনার মধ্যে কোথায় দু'একটা শিশু বুদ্‌বুদ্‌। কার চোখে পড়ে ?

অনেক মেয়ে, অনেক রঙ, অনেক রঙ্গ।

অনেক, অনেক তরুণী-মুখের হাসির হঠকারিতা।

পাখার বাতাসে রেশমী শাড়ির আঁচল খসে পড়ে। কিন্তু পাখার বাতাস তো ঝড় নয়, রেশমী শাড়ির আঁচল কি এতোই হাল্কা ? তবু, রেশমী শাড়ির আঁচল খসে পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে ওঠে যুবতী মেয়ের দল। শাড়ি সামলায়। ব্লাউজের হাতাটা কি গুটিয়ে গেছে ? গলার হারটা কি আঙিয়ার আঁড়ালে পড়েছে ? না, বড্ড জমাট বাতাস, ঘরটা গুমোট গন্ধে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মালতী, বাড়িতে তোর কি একটু এসেন্সও নেই ? এ কি, দিশী ? ওটা আবার এসেন্স না কি, তার চেয়ে স্নান করে আসছি আমি, জলটা এনে ছিটিয়ে দে। কোটি নেই ? ইভ্‌নিং ইন প্যারিস ? য়্যাশেস অফ রোজেজ ? গেঁয়ো পিসীমাকে সরা, ভিজে মুড়ির মতো চুপসে যাচ্ছিস দিনকে দিন। গালে রক্ত না থাক, রুজ তো আছে বাজারে। হ্যাঁ রে সুস্মি, ঠোঁট দুটো যে তোর পচা পানের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। টাঙির দামটা কি আজকাল খুব বেশী মনে হচ্ছে না কি ? সুকুমারকে বললেই পারিস। পয়সা খরচ না করে মেয়ের মন পেতে চায় না কি ও ?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সকলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, চকিত চোখে তাকায় দোরের দিকে।

শাড়ি খসখস করে ওঠে, কঙ্কণ কঁকিয়ে ওঠে, চুড়ির চূর্ণ আওয়াজ দোল খায় ঘরের বাতাসে। উৎসুক চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আলোর ঔজ্জ্বল্য যেন হঠাৎ বেড়ে যায়। অসংখ্য মেয়ে, আর অজস্র তাদের কথালাপের কাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ চায়ের আসর।

পেয়ালা পিরিচে ঠুন-ঠুন আওয়াজ হয়। অধীরতার পা দোলাতে থাকে কেউ কেউ। ওদিকে কে যেন চামচে দিয়ে চায়ের কাপে জল-তরঙ্গের মিহি বোল ফোটাবার চেষ্টা করছে।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ না এলে আজকের এই সযত্নে-গড়া চায়ের আসর, অনেক, অনেক পরিশ্রমের শ্রান্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে যে।

কিন্তু, সমীরণকে এরা কেউ দেখেনি। এক মালতী ছাড়া।

মালতীই আজ নিমন্ত্রণ করেছে সকলকে, আর বিশেষ করে সমীরণকে। কারণ, এরা সবাই তো এসেছে সমীবণকে দেখতে।

সমীরণ রায়?

এতোগুলি মেয়ের চঞ্চল হবার কী আছে। বয়সে সমীরণের চেয়ে ছোট কেউ আছে না কি? প্রেমে পড়তে বা প্রেম করতে যে বয়স প্রয়োজন সে বয়স কি হয়েছে সমীরণের?

আঠারো বছর বয়স সমীরণের।

তাই না কি? একেবারে শিশু! গোঁফ গজায়নি এখনো।

গজালেও তো শেভ করে আসতে বলতিস্। তা না হলে বলতিস্ ইনডিসেণ্ট!

কী করে?

কেউ কি জানে সে খবর। কী বা দরকার জানার। হ্যাঁ, দরকার আছে বৈ কী। রেজাল্ট কেমন, কোন্ ইয়ারে।

পড়াশুনোয় ইতি ?

রেবার কথা ভাবছিলুম।

পাইলট ? সে কি ? এত কম বয়সে।

হ্যাঁ, সমীরণ রায় হাওয়াই জাহাজের পাইলট। অদ্ভুত ডাইভ দিতে পারে। না, সিভিল য়্যাভিয়েশনে। আজ করাচী কাল লক্ষ্মৌ। কোলকাতা ? কালে-ভদ্রে আসে বৈ কী, এই যেমন আজ এসেছে। আবার কালই না কি যাচ্ছে এলাহাবাদ।

আসতে কি চায়, তিন-তিন বার মালতীকে যেতে হয়েছে, আবার ধরে আনতে পাঠাতে হয়েছে সুশোভনকে।

এই বয়সে অমন একটা সায়েন্স জানলো কী করে ? কে জানে। বেনারসে কোন এক সাধুবাবা, না না, বদ্রিকাশ্রমে কালিকমলির চটিতে, দূর, রামেশ্বরমের শঙ্করাচার্যের বর্তমান শিষ্যের কাছে।

মালতী জানে। মালতী, মালতী। না মালতী জানে না। বলতে কি চায়। এতো করে জিজ্ঞেস করি, বলে না কিছুতেই।

হাত ? হাতের রেখা-টেখা নিয়ে কারবার নয় ওর। স্রেফ তোমার কপালের দিকে চেয়ে বলে দেবে। যা খুশি বলবে, বাড়তি একটা কথা জিজ্ঞেস করো, বলবে না।

সাবধান। লজ্জা-শরম নেই। মুখের সামনে যা-তা বলে বসবে, অবশ্য যা সত্যি তাই। পারফেক্ট, করেক্ট টু দি পয়েন্ট। লুকানো টুকানো গোপন কিছু দোষ-ক্রটি যদি থাকে, সরে পড়ো এখনি।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

চঞ্চল হয়ে উঠলো সকলে। শাড়ি খস-খস করলো, চেয়ারে-টেবিলে ধাক্কা খেলো, পিরিচ ভাঙলো, পেয়ালা ওলটালো।

হর্ন বেজেছে। সুশোভনের গাড়ি পৌঁছে গেলো।

এসেছে, এসেছে।

আসবে বৈ কী। ও না এলে যে এ চায়ের আসর সার্থক হয়ে উঠতে পেতো না। এই আলোর অতিশয্য কি মিইয়ে যেতো না ও না এলে? অগুরু অডিকলনের আমেজ কি থাকতো এতোখানি তীব্র? সুন্দরী তরুণীদের কণ্ঠ-কাকলী ম্লান হয়ে যেতো না? নিঃশব্দ হতো না ওদের চোখের চকিত-চপল চঞ্চলতা? ক্ষয়ে যেতো না তুলিতে টানা ভুরুর রেখা? কষা লাগতো না সিনগেল চায়ের লিকার? পিয়ানোর শব্দটা কি মধুর মনে হতো?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

হ্যাঁ, এবার সত্যিই সমীরণ এসেছে।

উৎসুক আগ্রহে সকলে ছুটলো বারান্দার দিকে। ঐ কি সমীরণ না কি, সুশোভনের পিছনে পিছনে যে নামছে। চেহারাটা তো সুবিধের নয়। বড় রোগা, গায়ের রঙটাও কালো দেখছি। তা হোক্ গুণ আছে। ডিসেনসির জ্ঞান নেই কিন্তু একটা খদ্দরের পায়জামার ওপর খাদির পাঞ্জাবি। ইস্ত্রি নেই, ভাঁজ পড়েছে। চোখে চশমা নেই, পুরুষদের চোখে চশমা না থাকলে কি মানায়?

বায়রনের চোখে কি চশমা ছিলো?

সুশোভনের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো সমীরণ।

এই যে এই টেবিলে। মালতীই যে হোস্ট, টেবিলের মাথায় বসতে হবে তাকেই। মিস্টার দত্ত, এখানেই বসুন। ভিড় করার দরকার নেই। তোদের সকলের মুখই ও দেখবে। এতো কষ্ট করে সেজে-গুজে এসেছিস, দেখবে না!

সুস্মি, চায়ের ট্রেটা এদিক্ দিয়েই নিয়ে যা, লজ্জা কিসের।

দু'টো প্যাটিস আরো দিক, কেমন?

পেসট্রির প্লেটটা এদিকে সরিয়ে দিন না মিস্টার রয়।

সমীরণ উঠে দাঁড়ালো। মাপ করবেন, এতো সব খেতে পারবো

না। আমি যদি ঘুরে-ফিরে এঁদের সব দেখতে দেখতে কোকে কামড় দিই, অভদ্রতা হবে কি? আমি আবার বসে বসে খেতে পারি নে।

বেশ তো? তুমি যা করবে সেইটেই তো হয়ে দাঁড়াবে ভদ্রতা। নতুন স্টাইল ভেবে ফ্যাশনেবল্‌দের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

—আপনিই মিস্টার রয়? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছেন কেন? শেয়ারে আপনার কিস্‌সু হবে না। হাজার কয়েক এ মাসে গেছে, না? ছেড়ে দিন ও-পথ, যে চাকরিটার অফার পেয়েছেন সেইটেতেই লেগে পড়ুন, উন্নতি হবে।

—আর সমীরণ, এই এর নাম হলো বাণী বসু মল্লিক, জাসটিস্—

—বিগিনিং উইত আর এণ্ডিং-উইত এ' ভাওয়েল। তাই না? মানে আপনার প্রেমিকের নাম। লম্বা দোহারা চেহারা, আপনার চেয়ে আধ হাতটাক লম্বা। তাঁর ভাই তো গতো মাসে লটারিতে কিছু টাকা পেয়েছে।

সমীরণ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না। সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—কি রে বাণী, বলিস্‌নি তো এদ্দিন?

—নিজের চরখায় তেল দিন, অমন ভাবে দু'জনকে ঘোরাচ্ছেন কেন? মন ঠিক্ করে ফেলুন এক জনের দিকে।

—এই সুস্মি, এদিকে আয়।

—বাই জোভ, আপনি গত বারে আপনার পড়াশুনোয় ইতি করেছেন, মানে শেষ পরীক্ষাটা দিয়েছেন। কি করে ফার্স্ট হলেন নিজেই বুঝতে পারেন না, না? ইউ উইল গেট এ ক্লীন লাইফ, বেশ কেটে যাবে। মাস চারেকের মধ্যেই হঠাৎ বিয়ে হবে। হাসব্যাণ্ড, এ নাইস বয়, বিট ডার্ক কমপ্লেকশন, কিন্তু চমৎকার মানুষ, সুখ পাবেন।

সমীরণ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না। সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—মিস্টার ডাট আপনার বরাতটা একটু জেনে নিন?

—ওঃ আপনি, ইউ আর গেটিং এ লট্ অফ মানি নেক্সট মান্থ। আচ্ছা, মাস দুই আগে আপনার ওপর দিয়ে একটা য়্যাক্সিডেণ্ট গেছে, না? হ্যাঁ, একটা কথা, ও-সব ছেড়ে দিন, সমাজে বাস করে ও-সব ঘৃণ্য ব্যাপার, চাপা থাকে না। কেন মিছেমিছি সে-বেচারীর সুখ নষ্ট করছেন?

—সমীরণ এদিকে এসো।

—এক মিনিট। আচ্ছা, শুনুন শুনুন, আপনার নাম কি রেণু বা রেবা বা রেখা বা ঐ ধরনের কিছু?

—কাছাকাছি এসেছেন, রাবেয়া।

—ওঃ, তা এবার পরীক্ষাটা দেবেন না, ফেল করবেন নির্ঘাৎ। ভাবছেন অবশ্য প্রিপারেশন খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত—

সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—এই যে সমীরণ, ইনি হচ্ছেন মলিনা রায়।

—আপনার স্বামী কি এখনো নিরুদ্দেশ? এই মাসেই তো তাঁর ফিরে আসার কথা! দু'বছর সাত মাস, কবে গেছেন?… তবে, এই মাসেই তো ফেরবার কথা।…না, এবার সংসার-ধর্মের দিকেই মন যাবে, সন্ন্যাসী হবার শখ মিটে গেছে তাঁর।

—এ হলো সুরমা।

—ছিঃ। কিছু বলতে চাই না।…আপনার নাম?

—বাসনা বসু।

—ইউ আর এ লাকি গার্ল। বিয়েটা বছর তিনেক দেরি আছে, কিন্তু টাকার ওপর হেঁটে বেড়াবেন। অজস্র টাকা, এ রীচ হাসব্যাণ্ড হ্যালো, পালাচ্ছেন কেন?

—গীতিকা, পালাচ্ছ কেন ?

—বলুন।

—বাপ-মাকে বোঝান কাচ বলে, কিন্তু তাঁরা ঠিক্ বোঝেন, কোন্‌টা কাচ, আর কোন্‌টা হীরে। অবশ্য, দোষের কিছু নয় ; একটু মিষ্টি হেসে যদি দামী দামী উপহার পাওয়া যায়।

—আমার নাম ডরোথী পলিট, আমার ভবিষ্যৎটা বলুন তো।

—নমস্কার।…ভবিষ্যৎ ? ডিভোর্স'টা গ্র্যাণ্ট হবে। কিন্তু বড় ভুল করছেন। ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার। টাকার টানাটানিতে পড়বেন। আর তা'ছাড়া, ডাক্তারই তো।— তাঁর হার্টের ট্রাব্‌ল আছে।

আর সময় নেই সমীরণের। সমীরণ চলে যাবে। সমীরণ চলে যাবে।

—এ হলো আমাদের দলের ব্লু-জুয়েল, সুষমা।

—আপনার এক বোনের সঙ্গে আপনার ভগ্নীপতির ভাই প্রেম করছে। সাবধান করে দেবেন, মিছেমিছি বদনাম, য়্যাণ্ড ইট উইল এণ্ড ইন এ বাব্‌ল। আমি বড্ড টায়ারড ফীল করছি।

সমীরণ চলে যাবে।

শাড়ির শৈত্য চুমকির চমক খায়। পেয়ালা-পিরিচের টুং টাং। বিজলী লণ্ঠনের লোলুপ আলো মৃদু মিইয়ে আসে। কেদারা, কুর্সি, মেজ্ মনোকল। অকস্মাৎ ধাক্কা, গায়ে গা লাগা। চায়ের কেতলি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। পেস্ট্রির প্লেট শূন্য।

সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—সে কি, এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ, মুড নষ্ট হয়ে গেছে, এর পর যা বলবো সব ভুল হবে। চলুন সুশোভনবাবু, পৌঁছে দেবেন।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

—বোগাস।

—কিন্তু আমার তো ঠিক মিলেছে।

—ব্লাফ।

—কিন্তু, আমি তো সত্যই বুঝতে পারি না কি করে ফার্স্ট হলুম।

—যা-তা।

—কিন্তু, আমার টাকা পাওয়ার কথাটা তো কারেক্ট।

—ন্যুইসেন্স।

—কিন্তু, আমি যে ডিভোর্সের জন্য চেষ্টা করছি, তা তো সকলেই জানেন।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

সমীরণ এসেছিলো, সমীরণ চলে গেছে।

শাড়ির খসখসানি, কঙ্কণের কাঁপন আর চুড়ির চূর্ণ শব্দ। পেয়ালা পিরিচের টুং-টাং আওয়াজ। এসেন্সের আমেজ, সুরের শীর্ণতা, কথালাপের কাকলী। আলোর আতিশয্য, বেশবাসের বৈশিষ্ট্য, প্রসাধনের প্রাচুর্য।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

সমীরণ না এলে যে আজকের এই চায়ের আসরটা মাটি হয়ে যেতো।

এক খিলি মিঠে পান

বাবুলালের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ আজ থেকে পনেরো বছর আগে। আমার বয়সের অঙ্কটা তখন ঠিক কৈশোরের শেষ ধাপে। কিংবা সেটাকে যৌবনের প্রথম ধাপও বলতে পারো।

একটা রেলের কলোনিতে ছিলাম আমি। আমি আর বাবুলাল দু'জনেই। একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিলো ওর, আর সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আলাপ গড়ে উঠেছিলো।

অনেক নগর' নদী অতিক্রম করে পনেরো বছর পরে হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম শহর কোলকাতায়। আর বাবুলালকে আবিষ্কার করলাম এক নামজাদা সড়কের মোড়ে একটি পানের দোকানে। মিঠাই থেকে ঠাঁই বদলে বাবুলালও না কি ঘুরেছে অনেক জায়গায়। সারা যুদ্ধটা কাটিয়ে এসেছে কাপড়ের কলে, তেলের আড়তে, চালের গুদামে। বেশ কিছু টাকা জমিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে একটা পানের দোকান।

আমার আবাস থেকে ওর দোকানটা যে অনেক কাছে, শুধু সেই কারণেই নয়, আমার সান্ধ্য আড্ডায় যাবার পথেই ওর দোকানটা। তাই নিত্য-দিনের মতো আজ এক খিলি মিঠে পানের নেশায় ওর দোকানের উদ্দেশে চলেছিলাম। হাতে ছিলো একটা না-ধরানো সিগারেট। পকেটে একটি ডবল পয়সা—এক খিলি মিঠে পানের দাম। বাবুলালের দোকান থেকে একটি মিঠে পান কিনে মুখে পুরে তার পর তারই দোকানের দড়িতে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে সান্ধ্য আড্ডার দিকে পা চালাবো এই ছিলো ইচ্ছে।

চেনা-অচেনা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সত্যিকারের মানুষ দেখেছি খুব অল্প। বাবুলালের মতো হয় তো এক জনকেও না।

পনেরো বছর আগেকার একটা ঘটনা আমার আজও মনে আছে, এবং থাকবেও হয়তো বাকী জীবনটা।

ইস্কুলের ছাত্র আমি তখন, অতএব সংসারের একমাত্র বেয়ারা। কী যেন একটা পুজোর দিন। আমাকে আসতে হলো বাবুলালের দোকানে। পাঁচ সিকের মিষ্টান্ন কিনে নিয়ে যাবার জন্যে।

সন্দেশের ঠোঙাটা হাতে করে বাবুলালের দোকান ছেড়ে ঠিক পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চিল এসে মারলে ছোঁ।

পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খেলো সন্দেশের ঠোঙাটা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। ঠিক্ যেন বুঝতেই পারিনি কী হয়ে গেলো।

সংসারের অনেক কিছু করেও নিষ্কর্মার প্রতীক হতে হয় যে বয়সে, আমার তখন সেই বয়স। অতএব বুঝতেই পারো এর প্রতিফল কল্পনা করে আমার চোখে জল এসেছিলো কি না।

এমন সময় দেখলাম বাবুলাল তার দোকান থেকে হাসি-মুখে এগিয়ে আসছে।

—কী হলো খোকা বাবু?

জবাব দিতে পারলাম না।

বাবুলাল বললে, এসো খোকা বাবু, আউর মিঠাই লিয়ে যাও হামার দোকান থেকে।

বললাম, টাকা তো নেই আর।

উত্তর এলো, ও কি তুমার দোষে নষ্ট হয়েছে? লিয়ে যাও তুমি। পয়সা লাগবে না।

এবং তার পর সত্যিই এক ঠোঙা সন্দেশ বিনা পয়সায় দিয়েছিলো বাবুলাল।

সেই বাবুলাল আজ পনেরো বছর পরে শহর কোলকাতায় এক নামজাদা সড়কের মোড়ে পানের দোকান দিয়েছে।

একমাত্র সম্বল ডবল পয়সাটা বাবুলালের হাতে দিয়ে বললাম, এক খিলি মিঠে পান।

সযত্নে পানটা সেজে একটু সুগন্ধি সংযোগ করে আমার হাতে দিতে গেলো বাবুলাল। পাশাপাশি লোকের ভিড়ে হাতটা নড়ে যেতেই পানটা নীচে পড়ে গেলো।

পানটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী কে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার নিজেরও দোষ হতে পারে। হতে প[illegible] বাবুলালের।

আমি মুখ তুলে বাবুলালের দিকে তাকালাম।

বাবুলালও তাকালো মাটিতে-পড়া পানটার দিকে।

তার পর যথারীতি পান সেজে অন্যান্য খদ্দেরদের দিকে মনোযোগ দিলে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি। না, বাবুলালের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই এদিকে।

অকারণে একবার পকেট হাতড়ালাম। তার পর ধীরে ধীরে আড্ডার পথ ধরলাম। একটা মিঠে পানের অভাবে মনটা তিক্ততায় ভরে গেলো।

কিন্তু।

না, মনে হলো না, বাবুলাল মানুষ বদলে গেছে। শুধু বুঝতে পারলাম, একটা সত্যিকারের যুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছি আমরা। টাকার মর্ম বুঝতে শিখেছি। আর। আর প্লাবনের পরে [illegible] জমে না, পাঁকও জমতে পারে।

ঝুমরা বিবির মেলা

দারোগা অবিনাশবাবু বললেন, নির্ঘাত বাপবেটায় রেষারেষি হয়েছিলো কোনো—

কথা আর শেষ করতে হলো না। রেঞ্জার অমিয়বাবুও হাসলেন —অসম্ভব নয়, বুড়ো এই বছরখানেক আগে নাকি ষোল-সতের বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলো।

থানার সিপাই কালী মণ্ডল বললে, স্যার, নিজেই যখন সারেণ্ডার করেছে তখন ব্যাপারটাও জানা যাবে, কিন্তু ডাকাত ব্যাটা মরে ঠকিয়ে গেলো স্যার।

বুধন কিস্কুর মৃত্যুতে বিশেষ করে দারোগা অবিনাশবাবুই ঠকে গেলেন। এতোদিনের তল্লাস-তদন্ত সব ব্যর্থ হয়ে গেলো।

ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি, সারা কোলিয়ারী অঞ্চলটার অধিবাসীরা ভয়ে কাঁপতো দুর্ধর্ষ ডাকাত বুধন কিস্কুর নামে। তুড়ুক চাষীরা বলতো, ঝুমরা বিবি ডাইন হয়ে বুধনকেও শিখিয়ে দিয়েছে ঝাড়নি মন্তর। মারাং বুরুর পুজো দিয়ে সিদ্ধাই হয়েছে বুধন, আর তাই শালাই গাছের মাথায় চড়ে সোঁ সোঁ করে উড়ে গিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে ডাকাতি নয়তো রাহাজানি করে ফিরে আসে। থানা-হাকিমের সাধ্য নেই যে বুধনের টিকিতে হাত দেয়।

টিকি অবশ্য ছিলো না বুধনের, বাপের মতো নূরও রাখতো না। বুধন কিস্কু নামটাই ঘুরতো লোকের মুখে মুখে। কিন্তু আসল চেহারাটা কেউই দেখেনি। দেখে থাকলেও এমন বুকের পাটা কারও ছিলো না

যে, পুলিশের কাছে সে-কথা জানায়। একরামপুর থানার দারোগা অবিনাশবাবু তাই হার মেনেছিলেন। আর সরকারী ডাক লুঠের পর ঝুমরা বিবির মেয়ে আস্মিনার খুনের তদন্ত করতে করতে যখন বুধন কিস্কুর প্রায় সব ঘাঁটিগুলো জানা হয়ে গেছে, সোনাডির চারদিকে প্লেন ড্রেস বসানো—শুধু গ্রেপ্তারের অপেক্ষা, সেই সময় কিনা—

ছেলের ঘাড়ে টাঙির কোপ তো নয়, যেন অবিনাশবাবুর প্রোমোশনের পায়েই কুড়ুল বসিয়ে দিলে বুড়ো মিঞামাঝি।

অবিনাশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সারাটা জীবন এই একরামপুরের জঙ্গলেই কাটাতে হবে দেখছি। বুধনের দলেরই একটা লোক এসে খবর দেবে আর হাতে হাতকড়া পরাব ভেবেছিলাম। তা বদলির আর আশা নেই দেখছি।

নিরাশ হবারই কথা। যে-জঙ্গলে এক বছরের বেশি কোন দারোগা টিঁকতো না সেই বুনো তল্লাটে অবিনাশবাবুর জীবনই শেষ হতে চললো।

ছোট ছোট টিলার ঢেউ ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি অবধি। আর শাল-শালাই, মহুয়া আর আমলকীর গভীর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট সাঁওতালী গ্রাম। মাঝপথে একটা রোগা নদী—সোনাতুলসী। সোনাতুলসীর পারে খানকয়েক বাংলো। ফরেস্ট অফিসার ও তাঁর সহকারীদের দপ্তর-আবাস, বদলি হলেও যাঁদের সেই এক অরণ্য থেকে আরেক অরণ্য। কিন্তু অবিনাশবাবু তো বদলি হয়ে আধা-শহর ময়নাগড়ে যেতে পারতেন—কিংবা বরকাডিহিতে। তা নয়, এই জঙ্গলের মধ্যে থানা-হাকিম হয়ে শুক্‌নো সেলামে পেট ভরানো।

কাছাকাছির মধ্যে সোনাতুলসীর ওপারে ছোট একটি গ্রাম। পাহাড়ের ঢালু উপত্যকায় দু'চার বিঘে লাল মাটির ক্ষেত, আর দু'দশ ঘর তুড়ুক চাষী। তুড়ুক, অর্থাৎ মুসলমান।

বোধ হয় কোন প্রাচীনকালে তুর্কী সৈন্যের আগমন ঘটেছিলো এই অরণ্যাঞ্চলে, আর সেইজন্যেই মুসলমানদের নাম হয়েছিলো তুড়ুক। যেমন হিন্দুদের নাম ছিল দেকো।

একরামপুরের তুড়ুক চাষীরা এককালে ছিলো বনচর মানুষ। চাষের ক্ষেতে স্থায়ী ডেরা বেঁধে কিভাবে যেন মুসলমান হয়ে যায়। অবশ্য নামেই তুড়ুক, আচারে-বিচারে সিকিভাগ মুসলমানী, বারো আনা সাঁওতালী। মুখে সেই সাঁওতালী রড়, উর্দুর ছিটেফোঁটা মেশানো। দেবদেবী সেই কিঁসাড় বোঙা, হাড়াম বোঙা, রামসাল্‌গি, লিটা, জমসিম বোঙা। কিন্তু ওপারের লোক যেমন বলতো সবচেয়ে বুড়া হলো সিঙে বোঙা, তেমনি তুড়ুকদের সবচেয়ে বড়ো দেবতা এল্লা বোঙা!

সেই এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বুড়ো মিঞাঁমাঝি বললে, হুজুর থানা-হাকিম মিছা বলবো নাই। থানা-হাকিম আপনি, সাজা দিবার হয় ল'টকে দে।

ল'টকে দে, অর্থাৎ ফাঁসি দে।

শুনে হাসলেন অবিনাশবাবু—পাণ্ডে, সহায়, সিপাই কালী মণ্ডল।

আর হাসলেন অমিয়বাবু। বললেন, থানা-হাকিম! বেশ নামটি দিয়েছে কিন্তু।

দারোগা অবিনাশবাবু থানা-হাকিম, আর জমাদার গোবিন্দ সহায় ছিল দারোগা। বনপুলিশের দপ্তরে বসতেন বলে রেঞ্জার অমিয়বাবুর নাম ছিলো জঙ্গল-সাহেব।

জঙ্গল-সাহেবের বাংলোর বারান্দায় বসেই যথারীতি গল্পগুজব চলছিলো। রেঞ্জার অমিয়বাবু, দারোগা অবিনাশবাবু, জমাদার গোবিন্দ সহায়, এক ও হৃদয়নাথ পাণ্ডে এবং আরো দু'চারজন চাপরাসী আর কন্সেস্টবল। বাইরে অমাবস্যার অন্ধকারে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছিলো। অঝোর ধারায় বৃষ্টি তো নয় যেন আলকাতরার প্লাবন।

গাছের পাতার খসখসানি, বৃষ্টির রিমঝিম আর বনকড়িঙের ঝিঁঝিঁ— এরই মাঝে হঠাৎ একসময় ঠুক ঠুক করে এসে হাজির হলো বুড়ো মিঞামাঝি।

একমনে খৈনি টিপছিলো জমাদার গোবিন্দ সহায়, মেঝেতে বসে বসে। তারই সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ো।—সেলাম দার্গাসাহেব।

সরাসরি অবিনাশবাবুর কাছে এগিয়ে যাবার সাহস হলো না। শুধু গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা সামনে নামিয়ে রাখলো সে।

টিমটিমে একটা লণ্ঠন জ্বলছিলো বারান্দায়, তাই প্রথমটা বুঝতে পারেনি গোবিন্দ সহায়। ক্ষেতের খরমুজা দর্শনী এনেছে ভেবে বাঁ হাতে দুটো ঝাঁপা তালি দিলে, তারপর খৈনি টেপা বন্ধ রেখে গামছাটা খুলেই আঁতকে উঠলো—আরে রাম রাম সিয়ারাম, এ তো তিন শ' দো নম্বর কেস আছে।

অমিয়বাবু কিংবা পাণ্ডে তো দূরের কথা, অবিনাশবাবুও আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর বললেন, এই বৃষ্টিবাদলের রাতে জ্বালাতন দেখছি।

পরক্ষণে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলেন অবিনাশবাবু—আরে সোনাডির মিঞামাঝি না?

—হাঁ থানা-হাকিম। আপনরাই তো লটকে দিতিস হুজুর, তা বেঁটারে আমি কোঁপাই দিছি।

অবিনাশবাবু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, লট্‌কে দিতাম? কেন, কে তোর বেটা?

—ডারীটা আনে দেখ্‌না। উ হলো আমার বেটা বুধন কিস্কু। দে হুজুর লটকে দে।

অবিনাশবাবু হাসলেন।—বুড়ো-হাকিমের কাছে বিচার হবে তবে তো; ফাঁসি দিয়ে দেব এখনই? কিন্তু বুধন কে? ডাকাত বুধন কি তোর ছেলে নাকি?

বুড়ো ঘাড় নাড়লে শুধু।—হাঁ।

অবিনাশবাবু গোবিন্দ সহায়কে বললেন, বুড়োকে হাজতে রেখে ব্যবস্থা কর গোবিন্দ, মাথাটা এনেছে,ধড়টাও আনতে হবে তো।

বুড়ো মিঞামাঝি বুঝলো কথাটা। বললে, সে হুজুর সোনাডিতে আছে, বুড়ো হয়েছি, মুর্দা আনবার তাকত্‌ কুথায়? কিন্তু হাজত দিবি কানে হুজুর, লˈটকে দে। বোঙারা স্বপ্ন দিলেন বেঁটারে কুঁরবান দে; তো কুঁরবান দিছি, এখুন লˈটকে দে।

ছেলেকে খুন করেছে, সুতরাং ফাঁসি দিলেই যেন বুড়োর শাস্তি।

কিন্তু অবিনাশবাবুর দুঃখ বুধন কিস্কুর গলায় ফাঁসির দড়িটা নিজেই তুলে দিতে পারলেন না।

গোবিন্দ সহায় জনকয়েক কনেস্টবল, সিপাই কালী মণ্ডল আর কোমবে দড়ি বাঁধা মিঞামাঝিকে নিয়ে চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? কেমন যেন রহস্য রহস্য ঠেকছে!

অবিনাশবাবু হাসলেন।—রহস্য? রহস্য নয়, রীতিমত রহস্য উপন্যাস।

উপন্যাস সত্যিই।

তুড়ুক সাঁওতালদের গ্রাম সোনাডি। আব সে গাঁয়ের দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল বুধন কিস্কু। ময়নাগড থেকে বরকাডিহি, সারা তল্লাটের যতো খুনজখম, ডাকাতি, রাহাজানি সবকিছুর জন্যে লোকে দায়ী করতো বুধনকে। অথচ সাহস করে কেউ কিছু বলতো না। লোকটা যে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, কার ছেলে, কোন খবরই পাওয়া যেতো না। আব কি করেই বা পাওয়া যাবে। গাঁয়ের সাঁওতালরা বলতো, ও হুজুর ডাইনের মন্ত্র শিখেছে ঝুমরা বিবির কাছে। মারাং বুরুর নাম করে এখনই মানুষ আবার এখনই হরিণ, নয়তো পাখি। হাওয়ায় নাকি উড়ে যেতে পারে বধুন, সোনাতুলসীর জলে মিশে যেতে পারে।

আরেকজনের কথাও লোকে বলতো। সে হলো হরকরা নির্মল সিং। নির্মল সিংও নাকি মন্ত্র শিখেছিলো ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনার কাছে, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ করে হাওয়ায় উড়ে যেতো সেও।

লাঠির মাথায় ঘুঙুর বাঁধা, পিঠে মেলব্যাগ নিয়ে ময়নাগড় থেকে বরকাডিহি ছুটতো নির্মল সিং। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম শব্দ আসতো সন্ধ্যের দিকে, আর মাঝে মাঝে টানাটানা চীৎকার; স-র-কা-রী ডা-ক!

আবার ছুটতো নির্মল সিং, ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম। পিঠের মেল-ব্যাগে থাকতো চিঠিপত্র, পার্সেল, টাকাকড়ি। শনিবারে শুধু মনি-অর্ডারই নয়, সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকাও জমা পাঠানো হতো বড়ো ডাকঘরে।

ডাক হরকরার ওপর কেউ কোনদিন লোভের হাত বাড়ায়নি। কিন্তু হঠাৎ পরপর দুদিন নির্মল সিংয়ের ঘুঙুর বাজলো না। খবর এসে পৌঁছলো তৃতীয় দিনে।

রেঞ্জার অমিয়বাবু ভেবেছিলেন, লোকটা বুঝি বা এতোদিনে অসুখে পড়লো।

কিন্তু অসুখ নয়, চিরনিদ্রা। সোনাতুলসীর পারে তল্লাস করে পাওয়া গেলো মেলব্যাগটা। হরকরার লাঠি আর মেলব্যাগ যেমনকার তেমনি পড়ে আছে, আর কাছেই একটি মৃতদেহ।

না নির্মল সিং নয়, আঠারো-বিশ বছরের একটি পূর্ণযৌবনা সাঁওতালী মেয়ে। কেউ যেন গলা টিপে মেরেছে তাকে।

গাঁয়ের লোক বললে, ঝুমরা বিবির মেয়ে আসমিনা। মায়ের মতো মেয়েও ছিলো ডাইন। নির্মল সিংকে বশ করেছিলো মেয়েটা, লোভ দেখিয়েছিলো, তারপর সুযোগ দেখে কলিজা বের করে খেয়ে নিয়েছে, তাই নির্মল সিং বাতাসে মিশে গেছে। ডাইনরা যখন মানুষের কলিজা খায় তখন আর চিহ্ন রাখে না।

কিন্তু আসমিনা মরলো কি করে ?

বুড়োরা বললে, মা-মেয়ে দুই-ই ছিলো ডাইন। মাকে ভাগ না দিয়ে নির্মল সিংকে খেয়ে নিয়েছে—বলে ঝুমরা বিবি মেয়ের বুক চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে।

—তুরাতো হাস্যিস বাবুরা। ডাইন আছে কিনা পরখ দেখলি তো হাকিম ? বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিলো অবিনাশবাবুকে।

বুড়ো মিঞামাঝি ছিলো গাঁয়ের মাথা। বিঘে দুই-তিন জমি ছিলো বুড়োর। জনারের চাষ করতো।

তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন অবিনাশবাবু, সঙ্গে জমাদার গোবিন্দসহায়, জনকয়েক কনেস্টবল আর সিপাই কালী মণ্ডলকে নিয়ে।

বললেন, তোরা সকলে মিলে সাহায্য না করলে এ ডাকাত ব্যাটাকে ধরা যাবে না।

বুধন যে মিঞামাঝিরই ছেলে তা তো জানতেন না।

মিঞামাঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা খাটিয়া পেতে দিলো বসবার জন্যে। তারপর বললে, ঝুমরা বিবিটাই আসামী হুজুর, ডাইনটাকে সঁটকে দে, দেখবি বুধন ভালো হয়ে যাবে।

অবিনাশবাবু বুঝলেন কাজ হবে না এ ভাবে। রেঞ্জার অমিয়-বাবুকে এসে বললেন কি করা যায় বলুন তো। লোকটার কোন হদিসই কেউ দিচ্ছে না। সবারই ভয় বুধনকে ধরিয়ে দিলে ডাইনে কলিজা খেয়ে নেবে তার।

সোনাডির লোকগুলোর ওপর নাকি বোঙাদের দৃষ্টি ছিলো আগে। তারপর এই ঝুমরা বিবি ডাইন হলো। অন্ধকার রাতে মন্ত্র পড়ে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে বেরিয়ে যেতো ঝুমরা বিবি। একটা ঝাঁটা রেখে যেতো স্বামীর কাছে। আর মন্ত্রের ঘোরে ঝাঁটাটা জড়িয়ে শুয়ে সে ভাবতো ঝুমরা বিবিই বুঝিবা শুয়ে আছে। ঝুমরা তখন কুলোর ওপর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে বেরিয়ে যেতো।

গাঁয়ের অনেকে দেখেছে এ দৃশ্য, এল্লা বোঙার কসম খেয়ে বলতো তারা।

সে এক ভয়ঙ্কর চেহারা। কপালে চকচক করতো তেল-সিঁদুর, হাতে প্রদীপ, ঝুমরার কালো পাথরের শরীর দেখে মনে হতো যেন জোয়ান মরদের শক্তি তার হাতে। আর গুর্ভিন মেয়ের মতো তার ভারি লাজ দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হতো তারই কলিজা মুঠোয় পুরে নিতো ঝুমরা। শুধু কি তাই, সব ডেরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ভায়ে ভায়ে ঝামেলার মন্ত্র পড়ে আসতো, বাপ-বেটিতে পাপ লাগাতো, গোলার হুড়ুতে পোকা লাগিয়ে গাঁয়ের লোককে ভুখা মারতো।

বুড়ো মিঞামাঝি বলেছিলো, তখুন জানতাম না থানা-হাকিম, সত্যি ডাইন বটেক, কি ঝুটা।

--কি করে জানলি ? সিপাই কালী মণ্ডল জিজ্ঞেস করেছিলো।

মিঞামাঝি তার আধা-মাকুন্দ নূরে হাত বুলিয়ে বলেছিলো, ডাইন দেখলে চুপ থাকতে হয়। তো জানের বিচার যখন বললে, ঝুমরা ডাইন তখন গাঁয়ের সকলে বলে, আমরাও দেখেছি বটে।

সেই ঝুমরা বিবির বশ হলো বুধন কিস্কু। বোঙাদের ধরম মানলো না, নিজেকে ভাসিয়ে দিলো পাপের গাড়ায়।

দারোগা অবিনাশবাবুরও চোখ ছলছল করে উঠেছিলো অমিয় বাবুর কাছে সে-কাহিনী বলতে বলতে।

বলেছিলেন, কত দুঃখে যে মানুষ নিজের ছেলেকে মারতে পারে বুড়োর কাছে না শুনলে বুঝবেন না অমিয়বাবু। ঠিগিয়া সাদী হওয়ার পর আধা-জীবন কেটে যেতেও নাকি ছেলেপিলে হয়নি মিঞামাঝির। না বেটা না বেটি। তারপর ছেলে দিয়েই মারা গেলো মিঞামাঝির প্রথম বৌ।

—তারপর ?

মা না থাকলে বাপের আদর পেয়ে যা হয়। বুধন কিস্কু চাষবাস ছেড়ে শিকার করে বেড়ায়। ছোটোখাটো চুরি-জোচ্চুরি করে। তবু বাপ শক্ত হতে পারে না। শেষে ছেলে যখন জোয়ান হলো, পঞ্চায়েত বললে, বিধবা ঝুমরা বিবির সঙ্গে বুধনের পিরীত হয়েছে। ভয় দেখিয়ে জরিমানা করে কোন কিছুতেই যখন কাজ হলো না, তখন সবাই বললে, ঝুমরা বিবি ডাইনী। ওকে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

অমিয়বাবু বললেন, শুধু দুটো জিনিসই দেখছি ওদের জীবনে সত্যি, বোঙা আর ডাইনী।

অবিনাশবাবু বললেন, কিন্তু ডাইনী বললেই তো হবে না, জানের কাছে বিচার হলে তবে। ওঝার কাছে খাড়ি গুনিয়ে তারপর ধুনো সুপুরি ভাঁউনিচ নিয়ে যেতে হবে জানের কাছে।

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় স্টেটমেণ্ট দিচ্ছিলো বুড়ো মিঞামাঝি। অবিনাশবাবুর কথা শুনে বললে, "হাঁ হুজুর, জানে সব ঠিক ঠিক বললে, পরে বুন্দা চাইলে। বুন্দার টাকা দিলাম তো বললে বেটার মাথায় ডাইন ভর করেছে। তো পুছলাম ডাইন আছে কোন ওড়ায়? জান ঠিকানা বললে। তল্লাস করে ঝুমরা বিবি ডাইন হলো তো গাঁয়ের লোক হড়মদড়ম মার দিলে, বে-আব্রু করে ভাগায় দিলে মা-বেটিরে।

অগত্যা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে ডেরা বাঁধলে ঝুমরা।

সেই ঝুমরা বিবির খোঁজে লোক পাঠালেন অবিনাশবাবু। কিন্তু পরপর তিন দিন কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না তার। শেষে বুধন কিস্কুর ডেড বডি আর বুড়ো মিঞামাঝিকে চালান করে দিতে হলো বরকাভিহিতে।

দিনকয়েক পরে ঝুমরা বিবি ফিরে এসে যখন শুনলো বুড়ো মিঞামাঝি টাঙির কোপে কেটে ফেলেছে তার ছেলে বুধন কিস্কুকে, তখন কেঁদে গড়িয়ে পড়লো সে।

চোখের জল মুছে বললে, লটকা হবে তো হুজুর ঐ বুড়োটার ?"

অবিনাশবাবু স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন, কেন বাবা, বুধন কে ছিলো তোমার যে তার বাপকে লটকে দিতে চাও ?

ঝুমরা চোখের জল মুছে বললে, হুজুর, বুধনই বাঁচায় রাখছিলো আমাদের। না হলে ভুখা মরত্যাম থানা-হাকিম।

—তবে সতী ঠাকরুন, মেয়ে যখন মরে পড়েছিলো সোনাতুলসীর পাড়ে, তখন কেন বুধন কিস্কুর নামে ডায়েরি লিখিয়েছিলে ?

সবটা হয়তো বুঝলো না ঝুমরা, তবু যেটুকু বুঝলো সেইটুকুতে? অপ্রতিভ হলো।

বললে, সে হাকিম অনেক কথা।

যত চোখের জল মোছে ঝুমরা, ততই জলে ভরে আসে তার চোখ।

গাঁয়ের লোক•বিটলা করে গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে কি হবে, বুধন কিস্কু তার মন থেকে তাড়াতে পারেনি ঝুমরা বিবিকে।

অমিয়বাবু হেসে বললেন, পিরীত বটে। ওর চেয়ে দশ বছরের বড়ো এ মাগীটা, তার সঙ্গে কিনা······

অবিনাশবাবু হাসলেন।—যার সাথে যার মজে মন—

ফরেস্ট অফিসার পাণ্ডে বললে, সাচ্ অবিনাশবাবু। আগে পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারে।

তা এখানে জাত তো একই, তফাত যেটুকু তা শুধু বয়সের। তা'ছাড়া ডাকাত বুধন ছিলো বলেই না ঝুমরা বিবি ভুখা মরেনি। মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ের বাইরে ও যখন ডেরা বাঁধলে তখন ওর না আছে জমি, না চাঁদি। আর পয়সা দিলেও কেউ এক কণা চাল বেচতো না ওকে। সেই সময় বুধন কখনো কখনো মাঝরাতে একা হাজির হতো। চাল ডাল সোনা-দানা, লুটের মাল খানিকটা এনে দিতো ঝুমরা বিবিকে। হাঁড়িয়া খেয়ে ঝুমরা বিবির সঙ্গে রাত কাটাতো, আর উধাও হতো ভোর চমক দেবার আগেই।

সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঝুমরা।

বললে, হাঁড়িয়া খেলেই মনের ভিতরটা বেয়াদপ হয়ে যায় থানা-হাকিম। ভালো মানুষটা পাপী হয়ে যায়।

অর্থাৎ মনে পাপ ঢোকে। বুধনের মনেও একদিন সেই পাপ ঢুকলো। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে এসে বুধন-ডাকু হাঁড়িয়া চাইলে। তারপর নেশা যখন জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ ঝুমরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। বললে, বেটিকে লিয়ে আয়।

—ডাকু নেশা করলে হুজুর বাঘের মতো তেজ হয়। ঝুমরা বিবি বললে।

অবিনাশবাবু বললেন, আর তাই মেয়েকে এনে দিলি, কেমন?

ঝুমরা বিবি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না।

—তারপর?

তারপর বুধন যখনই আসতো, হাঁড়িয়া চাইতো। হাঁড়িয়া খেয়ে রাত কাটাতো আসমিনার সঙ্গে। শেষে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যে বেলায় এসে হাজির হলো। বললে, বেটিকে নিয়ে আয়।

অমিয়বাবু বললেন, বাঃ বেশ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার তো।

অমিয়বাবু হাসলেন।—তারপর? ডেকে দিলি আসমিনাকে?

ঝুমরা বিবি মুখ তুললো এতক্ষণে। বললে, না হুজুর। আসমিনা সাঁজের বেলায় সোনাতুলসী থেকে পানি আনতো। তো বেটি গাড়ায় পানি আনতে গেছে শুনে টাঙিটা লিয়ে চলে গেলো বুধন। তারপর তো তুরাই জানিস হুজুর। বলে কাঁদলে ঝুমরা ঠিক সেদিন মেয়ের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে যেভাবে কেঁদেছিলো।

সব শুনে অবিনাশবাবু বললেন, তবে আবার বুধনের বাপটাকে লটকে দিতে চাস কেন? মরেছে ভালই হয়েছে।

ঝুমরা বিবি চলে যেতেই অমিয়বাবু বললেন, ফাঁসি হবে?

—পাগল হয়েছেন? হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন, বছর কয়েক জেল অবশ্য হবেই।

মাসকয়েক পরে একদিন বরকাডিহি থেকে ফিরে এসে বললেন, জেলই হলো অমিয়বাবু, চার বছর। বুড়ো মিঞামাঝি এমন স্টেটমেণ্ট দিলে যে, কোর্টসুদ্ধ লোকের চোখে জল এলো।

—কী বললে? উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন অমিয়বাবু।

—বললে, হুজুর জন্ম দিয়েছি আমি, জীবনও নিয়েছি আমি। এখন আইনে ফাঁসি দিতে হয় দে। যে ছেলেকে কোলে-পিঠে করে আদর-যত্নে মানুষ করেছি সে যখন ভালো হলো না, ডাকাতি রাহাজানি করে, মেয়েদের বেইজ্জত করে এল্লা বোঙার কাছে বেইমান হলো তখন তাকে কেটে ফেলবো না তো মুর্গি বলি দিয়ে তার পুজো করবো।

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা ঠিকই।

ক্ষোভের হাসি হাসলেন অবিনাশবাবু। ওর বেটার নাকি দোষ ছিলো না, ডাইনীর বশ হয়েছিলো। কিন্তু রায়ে জেল হয়েছে শুনে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলো বুড়ো। ভাবলাম, ফাঁসি হবার জন্যে এতো আগ্রহ যার সে-লোক জেল হয়েছে বলে কাঁদে? জিজ্ঞেস করলাম তো বললে, হুজুর হিসাব ভুল হয়ে গেছে। লটকা না হলে বোঙারা খুশী হবেন নাই, বুধন ভালো হবে নাই।

একটু চুপ করে থেকে অবিনাশবাবু বললেন, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে ছেলেকে খুন করে। কিন্তু ডাইনী ভোলেনি।

পাণ্ডেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বিশোয়াস্, অমিয়বাবু।

বিশ্বাস।

সত্যি তাই। অদ্ভুত মানুষ এই তুড়ুক চাষীরা। একবার যা বিশ্বাস করে সারা জীবনেও তার নড়চড় হবে না, অমিয়বাবু বলতেন। বলতেন নতুন দারোগা সুধীনবাবুকে।

অবিনাশবাবু বরকাভিহিতেই বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, আর তাঁর জায়গায় এসেছিলেন সুধীনবাবু।

খুনজখম বা ডাকাতি-রাহাজানির কেস এলেই 'বুধন কিস্কু আর বুড়ো মিঞামাঝির গল্প শোনাতেন অমিয়বাবু।

বলতেন, সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড সুধীনবাবু। সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, বসে গল্প করছি আমরা, হঠাৎ সেই সময় ঠুক-ঠুক করে এসে হাজির হলো বুড়ো মিঞামাঝি, গামছায় ছেলের কাটা মুণ্ডুটা বেঁধে নিয়ে! সে কি আজকের কথা, সে প্রায় তিন-চার বছর হলো।

সেদিনও এমনি কি একটা গল্প হচ্ছিলো, হঠাৎ সিপাই কালী মণ্ডল ছুটতে ছুটতে এসে বললে, সোনাডির একটা গাছে গলায় দড়ি লাগিয়ে একজন বুড়ো ঝুলছে স্যার।

—আত্মহত্যা? সুধীনবাবু প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ স্যার, সুইসাইড কেস। কালী মণ্ডল বললে।

অমিয়বাবু, সুধীনবাবু, পাণ্ডে, সহায় সকলেই বেরিয়ে পড়লো। হাঁটুজল সোনতুলসী পার হয়ে এসে দেখলে, ভিড় ভেঙে পড়েছে গাছটার কাছে।

একটা সিপাই গাছে উঠে দড়িটা কেটে দিলো, ঝুপ করে মাটিতে পড়লো মৃতদেহটা।

অমিয়বাবু ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। বুড়ো থুথুড়ে একটা লোক, মুখের চামড়া জিলজিলে হয়ে গেছে।

কে যেন বললে, জঙ্গল-সাহেব, কয়েদ মকুব হয়েছিলো তাই সোনাডিতে ফিরে এসেছিলো বুড়ো মিঞামাঝি।

আরেকজন কে বললে, ডাইনটা মন্ত্র পড়ে বুড়োকে লটকে দিয়েছে হুজুর।

শুধু ঝুমরা বিবি বললে, না হুজুর, ডাইন নই আমি। সেটা

বাপের কথা রাখে নাই হুজুর, তাই গলায় দড়ি দিয়েছে বুড়ো। বেটা বুধন বলেছিলো জান বাঁচায় দিলে রাহাজানি করবে নাই।

অমিয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, কি বলছিস যা-তা।

সিপাই কালী মণ্ডল বললে, ঠিকই বলছে স্যার। গাঁয়ের লোকও বলছে, বুধন কিন্তু বেঁচে আছে।

—বুধন কিন্তু বেঁচে আছে? বিস্মিত না হয়ে পারেন না অমিয়বাবু।

কালী মণ্ডল বললে, তা না হলে এতো রাহাজানি হয় এখনো? ডাইনীটা বলছিলো, কে একটা লোক নাকি থানায় খবর দিতে আসছিলো, তাকেই তিনশো দুই করে দিয়েছিলো বুধন। অথচ গাঁয়ের চারিদিকে তখন পুলিশ।

—তারপর?

—তারপর বাপের কাছে মাঝরাত্তিরে গিয়ে বলেছিলো, এবার জান বাঁচিয়ে পালাতে দে, ডাকাতি ছেড়ে চাষবাস দেখবো। তা স্যার, তুড়ুকই হোক্, সাঁওতালই হোক্, বাপের প্রাণ তো। সেই ডেড-বডিটাই বুধনের বলে চালিয়ে দিলো।

সুধীনবাবু অস্ফুটে বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

কালী মণ্ডল বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বুড়ো ভেবেছিলো খুনের দায়ে ফাঁসি হবে ওর। আর ফাঁসি হলে তখন বাপের কলিজা বেটার বুকে এসে ঢুকবে। ডাইনী তখন ছেলেকে দিয়ে যা খুশি করাতে পারবে না।

অমিয়বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অন্ধবিশ্বাস! এইজন্যই উন্নতি হলো না লোকগুলোর!

কালী মণ্ডলও দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—যা বলেছেন স্যার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোকটা যখন ফিরলো, গাঁয়ের লোকদের নাকি চিনতেই পারেনি, একবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলো।

—তাই নাকি? বিস্মিত হলেন সুধীনবাবু।

—হ্যাঁ স্যার। কালী মণ্ডলের চোখও যেন ছলছল করে উঠলো। বললে, বুড়ো নাকি ছুটে বেড়াতো আর বলতো, লটকা হলো নাই, হিসাব ভুল হয়ে গেছে।

ফাঁসি হলেই যেন শাস্তি পেতো বুড়ো।

আর সেইজন্যই হয়তো নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরলে।

কিন্তু সোনাডির তুড়ুকরা বললে, না হুজুর, বেটার কলিজা খেয়ে মিঠা লেগেছিল ডাইনটার, তো বাপের কলিজাও খেয়ে নিছে।

এ-ঘটনার পর বহু দিন মাস বছর পার হয়ে গেছে। একরামপুরের থানা উঠে গেছে বরকাডিহিতে, বন-পুলিশের দপ্তরে এসেছে নতুন লোক, সবাই ভুলে গেছে ঝুমরা বিবিকে, বুড়ো মিঞামাঝিকে, ডাকাত বুধন কিস্কুকে। কিন্তু সোনাডির তুড়ুক চাষীরা ভোলেনি সে ঘটনা। এখনও শীতকালের দিনে সারা গাঁয়ের লোক মেলা বসায়—ঝুমরা বিবির মেলা। মেয়েপুরুষ সকলে দিনরাত নাচে-গায়, দোকানীদের সারি বসে—মিঠাই 'মাণ্ডী,' রঙ্গিন কাচের জল-চুড়ির। আর ভিড় ভেঙে পড়ে মোরগ-লড়াইয়ের দিনে। চারপাশের লোক ছড়া বাঁধে, গান গায় ঝুমরা বিবি আর মিঞামাঝির নামে। এল্লা বোঙার পুজো দিয়ে একটা মোরগের নাম দেয় ঝুমরা আর অন্যটা মিঞামাঝি—তারপর দু'জনেরই পায়ে ছুরি বেঁধে ছেড়ে দেয়।

যে বছর 'ডাইন' মরে, আনন্দ ধরে না আর গাঁয়ের লোকের। আর যে-বারে, 'মিঞামাঝি' মোরগটার চোট লাগে, সেবারে এল্লা বোঙার পুজো চলে সাত দিন ধরে। গাঁয়ের লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।

কিন্তু মিঞামাঝির সন্তানস্নেহের দিকটা চোখে পড়ে না ওদের। ছেলের জান বাঁচাবার জন্যে, ছেলেকে ভালো করবার জন্যে বাপ নিজের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাবে—এই তো সাধারণ নীতি। এ ব্যাপারে বিস্মিত হবে কেন সোনাডির তুড়ুক চাষীরা।

আমি নিজেও দেখেছি এ মেলা, ঝুমরা বিবির মেলা। দেখেছি সোনাডির মোরগ-লড়াই। এখন একে গল্প বলতে হয় গল্প বলুন, ইতিহাস বলতে হয়, ইতিহাস।

শুধু প্রথম কেন, প্রথম দিকের যে কোন একটা পরিচ্ছেদের পাতায় চোখ ফিরিয়ে আনন্দে রললে অরুন্ধতীর অসম্মতি নেই। কিন্তু, তারপর, একটার পর একটা পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জল-থৈ-থৈ পদ্মার পারে এসেই ভয়ে আঁতকে ওঠে ও। অন্ধকার সমুদ্রে এসে চোখ রোজে।

বিশাল বিস্তীর্ণ পদ্মার ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে, আর রাত-গভীরের দৃষ্টি-হারানো অন্ধকার। অনেক দূরের বাঁকে আর নদী-জলের মাঝডাঙিতে দুটো আলোর নিশানা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে, নিভছে; যেন ইশারায় কথা বলছে দূরের স্টীমারের সঙ্গে। চতুর্দিকে শুধুই অন্ধকার, অন্ধকারের পাড়ে সোনালী জরির তারার মতো একসারি টিমটিমে আলো। মাঝি-ঘুমন্তির ঘাটে সারি সারি নৌকোর লণ্ঠন হয়তো। দূরের চলন্ত স্টীমার থেকে ভেসে আসছে একটা মৃদু একটানা আওয়াজ, আর স্টীমারের ফণায় সার্চলাইটের মণিটা অবিরত ঘুরে চলেছে এদিকে ওদিকে, অন্ধকার ভেদ করে।

অরুন্ধতীর বেশ মনে আছে। মনে না থাকলেই যেন ভালো হতো।

হিজল ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দ পায়ে পালিয়ে চলেছে ওরা। বাবা, মা, ভাই, বোন,—সকলেই। দূরে দূরে দু'একটা আলেয়া জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। আর নিস্তব্ধতার মাঝে টুপ্ টুপ্ করে হিজলের ফল পড়ছে জলে—মনে হচ্ছে, কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। কথা নয়, জলের বুকে হিজলের ফল পড়ার শব্দ জেনেও ভয়ে আশঙ্কায় নিঃশ্বাস চেপে থেমে পড়ছে ওরা।

হাঁ, খেমে পড়তেই হলো শেষ অবধি। হৈ হৈ করে একটা উন্মত্ত বিভীষিকার দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অরুন্ধতীর জীবনে শুরু হলো নতুন একটি পরিচ্ছেদ।

একটি নয়, কয়েকটি পরিচ্ছেদ।

সে-সব দিনের কথা ভাবতে চায় না অরুন্ধতী। ভুলতে চাইলেও পৃথিবী ভুলে থাকবে কেন!

জীবনের স্রোত থামিয়ে দিয়ে নোংরা জলে মুখ গুঁজে থাকতে চেয়েছিল অরুন্ধতী। ভেবেছিলো, নোঙর তোলার সম্ভাবনাই যখন নেই, চোখে কল্পনার রঙ বুলিয়ে কি হবে? তার চেয়ে ভালো-না-লাগার ঘরকেই মায়া-মমতার নরম-গরম পালক দিয়ে চেপে ধরতে দোষ কি! এতো শতো ভেবেই না শেষ অবধি ঘৃণার স্বামীকে বিনা বাধায় গ্রহণ করেছিলো ও। স্বামী? শব্দটা মনে পড়লেও বিদ্রূপে বেঁকে যায় ওর ঠোঁটের হাসি। তবু সেই অসুর-প্রেমের অযাচিত সন্তানকে মাতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলো, স্নেহে প্রীতিতে।

বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে খবরই রাখতো না অরুন্ধতী। কোন খবরই এসে পৌঁছতো না ওর কাছে। পাতালপুরীর বন্দিনী দুঃখকন্যার মতো সব আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করছিলো শুধু। নিজের বলে মনে হয় না এমন এক ছোট্ট ঘরের অন্ধকার কোণে মুখ লুকিয়ে মন লুকিয়ে।

তারপর হঠাৎ একদিন দারোগা-পুলিশ এলো, এক রাজ্যের অন্তরীণ যেন অন্য রাজ্যের খাঁচার কপাট খোলা পেলো। ফিরে এলো অরুন্ধতী, কিন্তু সেই পুরোনো দিনের সুখ-সংসারে নয়। তবু মুহূর্ত কয়েকের জন্যে, রিক্ত বালিয়াড়ির গায়ে কয়েক টুকরো খুশির অভ্র চিকচিক করে উঠলো। না-বোঝা-প্রশ্ন চাপা পড়ে রইলো ভাই-বোনের মনে, ফিরে পাওয়ার আনন্দেই ওকে জড়িয়ে ধরলো তারা। মা'র মুখ উজ্জ্বল হলো না সত্যি, কিন্তু বোঝা গেলো, অনেক

ঝড়-সওয়া ঐ পাথুরে মুখ আসলে মিথ্যার মুখোশে ঢাকা। এতো বছর বাদে মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চাইছেন তিনি, কিন্তু অরুন্ধতীর কোলের ছোট্ট এক টুক্‌রো ঐ শিশু মা-মেয়ের মাঝখানে মস্ত বড় একটা দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু কি মা?

পাড়াপড়শীদের কানেও খবর রটতে দেরি হলো না। তবু মজা দেখবার জন্যেই হয়তো, এমন ভাব দেখালে তারা যেন কিছুই জানে না। এমন কপট হৃদ্যতার ভাষায় কথা বললে, যেন অরুণির মা নতুন আসেননি এ-পাড়ায়, নতুন পরিচয় নয় তাদের সঙ্গে।—শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি? সরলতম চোখে প্রশ্ন করলো হয়তো কেউ।

এ-প্রশ্নের আর কী-ই বা জবাব দেওয়া যায়। চুপ করে রইলেন অরুন্ধতীর মা, অনেকক্ষণ। মাথা হেঁট করলেন ম্লান মুখের অস্বস্তি ঢাক্‌বার জন্যে। শেষে অনেক চেষ্টায়, চোখের জল চেপে শুধু বললেন, দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো।

—ও মা, তাই নাকি? সমবেদনায় সহানুভূতিতে চট করে সবাই চোখ সজল করে তুললো।—কি রক্তখেকো দাঙ্গাই যে লেগেছিলো দিদি! চোখে কাপড়ের পাড় ঘষলো তারা।

কে একজন বললে, যাক্ ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব।

বিদ্রূপটা বুঝতে পারলেন অরুন্ধতীর মা, কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

অরুন্ধতীও শুনছিলো কপাটের আড়াল থেকে। আর লজ্জায় গ্লানিতে মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলো ও। গ্লানি নিজের জন্য নয়, ও কি করবে, অন্য কোন পথ ছিলো নাকি ওর সামনে। কিন্তু ওর জন্যে মা মুখ তুলতে পারবেন না, এ কথা তো কৈ কোনোদিন মনে হয়নি।

মনে হয়নি ? ভাবেনি কোনোদিন ? তা হলে সেদিন দারোগা-পুলিশের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিলো কেন ? কেন বলেছিলো, ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না আমাকে, আমি বেশ আছি, সুখে আছি।

এতোগুলো অনুনয়ের পিছনে তো একটাই কথা ছিলো, একটাই ভয়। ফিরে গেলেও কি আবার সব ফিরে পাবো ? বাবা, মা, ভাই, বোন—সকলেই কি ফিরে নেবে আমাকে ?

মনে মনে ঘৃণা আর আক্রোশ পুষে যাকে স্বামীত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলো অরুন্ধতী, তিন বছরের অভ্যস্ত আসঙ্গে সে নিশ্চয়ই এমন কোন মায়ার শিকড় গাড়েনি তার জীবনে। হ্যাঁ, শুধু এক-জনকেই সে নিখাদ প্রীতিতে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলো, তার নিজেরই রক্তশিশুকে।

এমন যে হবে তা জানতো অরুন্ধতী। বুকের মমতা যেদিন এই অবাঞ্ছিত সন্তানের সঙ্গে স্নেহ-প্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে রাজি হয়নি, সব হারানোর জীবনে এই সামান্য পাওয়ার উজ্জ্বল রামধনুটুকু যেদিন মুছে ফেলতে চায়নি ও, সেদিন থেকেই তা জানে অরুন্ধতী। কিন্তু, মা'র কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন সমস্ত শরীর ওর ক্রোধে আক্রোশে জ্বলে উঠলো।

—যাক্, ভালোয় ভালোয় যে ফিরে পেয়েছেন দিদি, এই খুব। পড়শী প্রৌঢ়ার এই কথাটাই যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো ওর চোখে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। দৃঢ় ক্রোধের গলায় বললে, ভালোয় ভালোয় যে আসিনি তার সাক্ষীও এনেছি।

ওমা, তেজ কেন মেয়ের এতো, ভাবলে সবাই। পাঁচ বছর ধরে জাতজন্ম খুইয়ে কোলে একটা ছেলে নিয়ে ফিরতে হলো যাকে, কোথায় সব সময় মুখ লুকিয়ে থাকবে, চোখাচোখি হলে মাথা হেঁট

করবে, তা নয় স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব। তবু সান্ত্বনা দেবার ভান করে কেউ কেউ বললে, তোমার তো দোষ নয় মা, তুমি কি করবে।

আড়ালে অবশ্য ঠোঁট টিপে ইশারায় হাসাহাসি করলে ওরা। অর্থাৎ, এখন তো বলছে দাঙ্গায় হারিয়ে গিয়েছিলো, দাঙ্গায় না কিসে ভগবান জানেন।

অরুন্ধতীর আর কি করবার আছে, বিছানায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা ছাড়া আর কি উপায় আছে ওর।

দু'চোখ ভিজিয়ে অরুণি শুধু কাঁদলো আর কাঁদলো। কোন ফাঁকে যে মা এসে তার পাশে বসেছেন, ব্যথায় কাঁপা হাত রেখেছেন ওর মাথায়, ধীরে ধীরে ওর চুলে পিঠে সান্ত্বনার সমবেদনার হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করেছেন, তা ও টেরও পায়নি।

—ওঠ্ মা, ওঠ্, কাঁদিস্ না আর। বলতে গিয়ে গলা কেঁপে গেছে তাঁর, গলা ভারি হয়ে এসেছে। বলেছেন, লোকে কি ভাবলো না ভাবলো তাতে কি আসে যায় অরু?

ধড়মড় করে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। অশ্রুভেজা দু'চোখের স্পষ্ট দৃষ্টি ফেলেছে মার মুখের ওপর।

বলেছে, তবে, তুমি কেন লজ্জা পাও, তুমি কেন সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

—সাধে কি ভয় পাই মা? দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া জল মুছতে মুছতে মা বললেন, দাঙ্গায় তোকে, তোর বাবাকে, দু'জনকেই তো হারিয়েছিলাম মা। তোকে যে ফিরে পাবো ভাবিনি কোনদিন, ফিরে পাবার জন্য যে কতো মানত করেছিলাম!

অরুন্ধতীর গলার স্বরে অভিমান ফুটে উঠলো। বললে, ভুল করেছিলে। সেইজন্যেই হয়তো বিষ খেয়ে মরতে সাহস পাইনি। মরলে সব জ্বালা চুকে যেতো।

—তোর বাবা যদি বেঁচে থাকতেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা;

বললেন, উনি থাকলে এতো ভয় পেতাম না অরু। কিন্তু একা, এই পাড়াপড়শীদের মাঝে সাহস পাই না একেবারে।

—তা হলে কী করতে হবে আমাকে বলে দাও। কান্নায় ভেঙে পড়লো অরুন্ধতী।

স্পষ্ট করেই বলতে পারলেন অরুন্ধতীর মা।

বললেন, এক কাজ করলে হয় অরু? ছেলেটাকে অনাথ আশ্রমে রেখেও তো আমরা দেখাশোনা করতে পারি।

চমকে চোখ তুললে অরুণ।—কী বলছো মা? তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পাবে।

কোন কথা বললেন না মা। আশ্চর্য! অরু তো এমন ছিলো না, এতো অবাধ্য হলো ও কী করে? মতে মিলুক না মিলুক, এটুকুও কি বোঝে না যে, ওর ভালোর জন্যেই তাঁর এতো দুশ্চিন্তা। এতো চোখ ঝাঁজানো কথা তাঁকে বলে কী করে অরু। ভুলে যায় কেন যে যতো কিছুই ঘটে থাকুক অরুন্ধতী ওঁরই মেয়ে।

কিন্তু সে-কথা অরুণি বুঝবে কি করে।

কত কান্নাকাটি, কত অনুনয় বিনয় করে ওর বাপের কাছ থেকে ছেলেটাকে ভিক্ষে চেয়ে এনেছে অরুন্ধতী, তা কি অরুর মা বুঝতে পারছেন। শুনলে হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, ভাববেন মেয়েটার বুঝি বা মাথার ঠিক ছিলো না।

না সে-কথা বলে লাভ নেই। অরুন্ধতী শুধু বললে, না, মা, তা হয় না।

তবে? এমনিভাবে পাড়াপড়শীর ফিসফিসানি, আড়ালে আড়ালে হাসি-বিদ্রূপ ছড়ানো দেখেও সব সহ্য করে যেতে হবে? তিনি না হয় চোখ বুজে থাকবেন, কিন্তু অরু কি সে-সব দেখতে পায় না, দেখেও কি মাথা উঁচু করে চলতে পারবে? ভেতরে ভেতরে শুধু

শুকিয়ে যাবে দিনকে দিন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, বিজু আর কলি বড়ো হচ্ছে, ওদের মনও কি এ-গ্লানির স্পর্শ পাবে না?

বললেন, তবে অন্য পাড়ায় উঠে যাই মা চল্।

—সব পাড়াই তো সমান। অরুন্ধতী হাসলে।—গায়ে ঘা দেখলে কোন্ পাড়ায় না মাছি বসে মা।

—সাধ-আহ্লাদ তো তোর শেষ হয়ে গেছে। থেমে থেমে—বেশ বোঝা গেল, ভয়ে ভয়ে—কথা শেষ করলেন মা।—না হয় একটা থান কাপড়ই পরবি অরু।

অরুণি হেসে উঠলো খিলখিল করে। কতো দুঃখে যে মানুষ এমন পাগলের মত হাসতে পারে, মা বুঝলেন। আশ্চর্য। সধবাই হলো না যে কোনোদিন, তাকে বিধবা হতে বললেন! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—জানি না মা, যা ভালো বুঝিস্ কর।

ভালো বোঝবার আর কি আছে। ভালোর পথ কি আর প্রশস্ত আছে কোথাও? শীর্ণ সড়ক ধরে আঁকাবাঁকা গলিতে আনাগোনা ছাড়া উপায় কৈ!

তাই মা'কেই একদিন বলতে হলো, যে ক'টা টাকা ছিলো, আর আমার খান কয়েক গয়না, যা দিদির কাছে গচ্ছিত ছিলো, তা তো সব শেষ হয়ে এলো অরু। গায়ের গয়নাগুলো ছিলো বলে তবু বিজু আর কলিকে বাঁচাতে পেরেছিলাম। কী করা যায় বলতো?

—কী আর করবে। চাকরির চেষ্টা করি একটা—উত্তর দিলে অরুন্ধতী।

সুতরাং চাকরির চেষ্টাতেই ঘোরাফেরা শুরু হলো অরুন্ধতীর। খবরের কাগজ দেখে চিঠির পর চিঠি লেখা, আর নয়তো বেশ স্পষ্ট পোশাকে মুখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বিনয়ের অবতার সব কাঁচা বয়সের ছোট সাহেবদের সঙ্গে দেখা করা।

এমনি কোনো এক আপিসের সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে, ব্যথায় বিরক্তিতে সমস্ত মন যখন ভরে আছে, পাশের লোকটার সঙ্গে একটা ধাক্কা লাগলেও যখন চোখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয় না, এমনি একটা মুহূর্তে অভাবনীয়ভাবে সুবিমলের সঙ্গে ওর আবার দেখা হয়ে যাবে, কে জানতো!

এতোদিন বাদে আবার দেখা হলো।

অরুন্ধতীর সারা মনের কোণে পাপড়ি ফোটানো গুঞ্জন শোনা গেলো।

—সুবিমলদা!

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে সুবিমলের ওপর চোখ পড়তেই অরুন্ধতী থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলো সুবিমল। ও আরো খানিকটা কাছে আসতেই নিঃসন্দেহ হলো অরুন্ধতী, সমস্ত মুখেচোখে খুশির ফুলঝুরি জ্বালিয়ে বলে উঠলো, সুবিমলদা তুমি!

চম্‌কে চোখ তুলে অরুন্ধতীর দিকে তাকালে সুবিমল, কয়েকটা দ্রুত মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় দেখালো সুবিমলকে। তারপর ওর ম্লান বিষণ্ণ মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।—অরুণি? অরুন্ধতী?

আশেপাশে কে কোথায় আছে না আছে, কে কী ভাবতে পারে, কিছুই মনে পড়লো না ওর। সুবিমলের একটা হাত চেপে ধরে বললে, ওঃ, কতদিন বাদে দেখা বলো তো সুবিমলদা। তোমার সঙ্গে আবার যে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি। কোথায় আছো? এখানেই তো? মাধু, মাধুরী কোথায়। মাসীমারা ভালো আছেন? বিয়ে করেছো, করোনি তো? মা তোমাকে দেখলে কী খুশী যে হবে!

অনর্গল অগুনতি কথার তোড়ে সুবিমলের উত্তরটুকুও বোধ হয় ভেসে গেলো। হাত ধরে তাকে টানতে টানতে নীচে নেমে গেলো অরুন্ধতী।

—তারপর? কী খবর বলো সুবিমলদা, চুপ করে আছো কেন? কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন? কী করছো, চাকরি?

কথার যেন আর শেষ নেই। কতো প্রশ্ন, কতো কথা। সব জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন একসঙ্গে ভিড় করে আসে। কোন্‌টা আগে বলবে, কোন্‌টা পরে, কোন্ প্রশ্নের পরে কোন্ প্রশ্ন—সবকিছু যেন নিয়ম ভুল করছে। এতোদিন বাদে মা-ভাই-বোনদের ফিরে পেয়ে যতো না আনন্দ হয়েছিলো, আজ হঠাৎ সুবিমলের দেখা পেয়ে যেন সত্যিই অরুন্ধতীর মনের পাতায় রোদ লাগলো, সবুজ রঙ ধরলো। আর এই উচ্ছৃঙ্খলতার ঢেউয়ে নিজেকে সে এতো বেশী ভাসিয়ে ফেললে যে, বহুক্ষণ পরে তবে ওর হুঁশ হলো সুবিমল জবাব দিচ্ছে না ওর কথার।

—আরে, বেশতো। কথা বলছো না যে। চোখের ভুরু কাঁপালে অরুণির। টুক্‌রো বিষণ্ণ হাসিতে ম্লান হলো সুবিমল।—কিন্তু আর বলবার কী আছে।

সুবিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের ছায়া অনুভব করলে অরুন্ধতী।—কেন, কি হয়েছে সুবিমলদা, বলো না।

হাসলে সুবিমল।—কী আর হবে, কী হতেই বা বাকি আছে অরুণ।

অরুন্ধতী বুঝলো, কী যেন ব্যথার ছাপ সুবিমলের মুখে, কি যেন লুকোতে চাইছে সুবিমল। ওর মুখের অনর্গল প্রশ্নে আপনা থেকেই যতি পড়লো।

দুপুরের রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে গির্জার ছায়ায় এসে দাঁড়ালো ওরা দু'জনে। রাস্তার সশঙ্কিত হর্নের হাত থেকে রেহাই পেতে। শুধু কি তাই? না। দীর্ঘ এক যুগ পরে দু'জনের আবার দেখা হলো। অভিশপ্ত আকস্মিকতার দেয়াল যে ঘনিষ্ঠতা, যে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের যুগস্রোতে বাঁধ টেনেছিলো, সে-বাধা এতোদিন পরে

অপসৃত হলো। ঠিকানাহারা ছুটো সমান্তরাল ঢেউ নতুন করে পরস্পরকে খুঁজে পেয়ে, স্তব্ধ হয়ে রইলো। কথার মতোই পথও খুঁজে পেলো না।

ওরা শুধু অনুভব করলে পরস্পরকে ওরা হারিয়েছিলো, পরস্পরকে আবার খুঁজে পেয়েছে। হ্যাঁ, অনেক কথা জমে আছে মনের কোণে, অনেক, অনেক কথার বরফ গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে যেন শান্তি নেই। কত কি শোনবার শোনাবার আগ্রহ ছু'জনের! কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, ধীরে ধীরে একটি একটি করে চীনে বাদাম ছাড়ানোর মত করে কথা বলবে। জানবার এবং জানাবার কথাগুলো যেন সোডার বোতল খোলার মতো একসঙ্গে উপচে আসতে চাইছে। তবু কেউ যেন কোন কথাই খুঁজে পাচ্ছে না। কোথায় যাবে, দাঁড়াবে, বসবে, বলবে কথা, কথা!

নিতান্ত আজেবাজে, অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক ছু'এক টুক্‌রো শব্দের সুর, ছু'এক ঝলক হীরে-জ্বলা হাসি।

কিন্তু এমন তপ্ত রোদ্দুরে গির্জার পাশে এমন ব্যস্তত্রস্ত জনচাঞ্চল্যের মাঝে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

অনেক কিছু আশা করেছিলো অরুন্ধতী। ভেবেছিলো, সেই আগের দিনের মতো সুবিমলই পথ বাতলে দেবে। কথার সুতো তুলে দেবে অরুণির হাতে। কিন্তু, না, সুবিমলও যেন দিশেহারা।

শেষে অরুন্ধতীকেই বলতে হলো, চলো সুবিমলদা, আমাদের ওখানে। মা যে কি খুশি হবেন তোমাকে দেখে। সত্যি, কে কোথায় যে ছিটকে গেলো……এতো কষ্ট হয়। একটা চেনা লোকও দেখতে পাইনে।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে সুবিমল। বললে, চেনা লোক হয়তো অনেকেই আছে অরুণ, কিন্তু সবাই লুকিয়ে থাকতে চায়।

মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী, কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে।

বললে, মুখ লুকোবার আর কি আছে বলো। কিন্তু বলে ফেলেই বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। ওকে উদ্দেশ করেই কি বলেছে নাকি সুবিমল? ওর কলঙ্কের কাহিনী কি সুবিমলেরও জানা?

সুবিমলের ভালোবাসাই ছিলো ওর অলঙ্কার। কলঙ্কের কালিতে সে প্রেম কি মলিন হয়ে গেছে? সব মন কি একই মানুষের?

ভয়ে কাঁপলো অরুন্ধতী। ওর জীবনের যে করুণ পরিচ্ছেদটা ও সদম্ভে আর পাঁচজনকে জানিয়ে মনের আক্রোশ মিটিয়েছিলো, আজ সুবিমলের কাছে তা প্রকাশ হয়ে যাবার আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাস কেন অরুন্ধতী!

তবু সুবিমলকে নিয়ে এলো ও, বললে, কলি যে কত বড়ো হয়ে গেছে দেখবে চলো। বিজু আর মা যে কি খুশী হবে!

সুবিমল এলো ওর সঙ্গে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতো, যখন একরাশ বই বুকে চেপে কলেজ থেকে ফিরতো অরুণি, রোদ্দুরের তাপে ডালিমের ছোঁয়া লাগতো ওর গালে, কপালে ফুটতো স্বেদ-সিক্ত পোখরাজের মালা। অপেক্ষা করতো একটা নির্জন গলির মোড়ে, সুবিমল আসতো, হাসতো, কথা বলতো, প্রথমে ইশারায়, তারপর স্পষ্ট ভাষায়, হাঁটতো পাশাপাশি দুপুরের নির্জন রোদ্দুরের পথে। ওরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে এলো, ট্রাম ধরলো, ট্রাম থেকে নামলো, পিচ-গলা বড়ো রাস্তা ছেড়ে, ছোট্টগলির বাঁকে, রোদে ঝলসানো গ্যাসপোস্টের নীচের ডাস্টবিনের চারপাশে ছড়ানো জঞ্জাল লাফিয়ে লাফিয়ে, এপাশের চারতলা বাড়ি আর ওপাশে পাঁচতলা, তারই ফাঁকে সরু গলির চেয়ে আরো সরু মেটে কাদার পথটুকু পার হয়ে, সবচেয়ে কোণের, উপেক্ষিত, বে-বাতাস নিরালা ঘরের কপাটের সামনে এসে দাঁড়ালো দু'জনে, কড়া নাড়লো অরুন্ধতী, মা এসে দরজা খুলে দিলেন। হঠাৎ বুঝি খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ ম্লান হলো।

স্যাঁত সেঁতে নীচের তলার ছোট্ট অন্ধকার না-বাতাস না-আলো এক-জানালার ঘরে এসে বসলো সুবিমল। ভাবলে, এ বাড়ির ছাদে যখন বিকেলে ম্লান হলুদের আলো নামে, এ-ঘরে তখন সন্ধ্যা। শহরে যখন সাইক্লোন, এ-ঘরে শুধুই শব্দ।

তবু। এ-ঘর অরুন্ধতীর ঘর।

মা'র দীর্ঘশ্বাস বললে, কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। বললেন, তোমরা তো দেখেছো বাবা সেই বাড়ি বাগান; স্টেশনে নেমে ওঁর নাম বললে লোকে পৌঁছে দিয়ে যেতো। কোথায় এসে উঠতে হয়েছে দেখে যাও!

সুবিমলের আকাশে তখন নতুন তারা ফুটছে। অরুণির চোখের তারায় ঘন গভীর আলো। কোত্থেকে কোথায় এসেছি দেখে যাও। সুবিমল ভাবলে অনেক সমুদ্র পার হয়ে নতুন বন্দরে।

অন্ধকার ঘরের ছোট জানালাটার ধারে বসে, কাঁধের ওপর অরুণির ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁয়ায়, সুবিমল জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেললো। সে-চোখ পাশের বাড়ির দেয়ালে চাপা পড়েও অনেক, অনেক দূর দিগন্তে পৌঁছে গেলো!

অরুণির মন প্রশ্ন করলে, আমাদের সব স্বপ্ন কি মিথ্যে হয়ে গেছে সুবিমলদা!

সুবিমলের মনেও দ্বিধা।—যা হারিয়েছি তা কি ফিরবে না?

তারপর ওরা যখন পরস্পরকে একান্তে পেলো, সুবিমল অরুন্ধতীর মুখের দিকে মুগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালে, কাছে টানলে অরুন্ধতীকে, ওর হাতের সুপুষ্ট আঙুলগুলোর সঙ্গে অরুণির নরম আঙুলগুলি আঙুরের লতার মত জড়িয়ে গেলো।

ওরা দু'জনেই যেন অনেকগুলো আড়াল দেয়া ব্যর্থ বছরের পিছনে ফিরে এলো।

সুবিমল চোখ মেলে তাকালো অরুন্ধতীর দিকে, সমস্ত শরীর

দিয়ে অনুভব করলে অরুণি। দু'জনেই যেন বলতে চাইলো, আমাদের মন যখন বদলায়নি ; পৃথিবী বদলে গেলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু মনকে কতটুকুই বা বিশ্বাস! ভয়ে কাঁপলে অরুন্ধতী। সব কিছু জানার পরও কি সুবিমলের মুখে এমনি ভালবাসার জ্যোৎস্না থাকবে?

মা এসে দাঁড়ালেন। কচি ছেলের দুধে খাজনা বসিয়ে সুবিমলের জন্যে চা নিয়ে এলেন মা, কাঁসার গ্লাসে করে। কথা শুরু করলেন সুবিমলের সঙ্গে।

কপাটের আড়ালে গিয়ে ইশারায় মা'কে ডাকলে অরুন্ধতী। মা'র হাত দুটো চেপে ধরে ফিসফিস করে বললে, মা! বলো না। আর কিছু বলতে পারলো না অরুণি।

—দূর বোকা মেয়ে! হেসে ফিরে এলেন তিনি সুবিমলের কাছে।

দেখলেন না, ঝরঝর করে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অরুন্ধতীর।

না, এ যেন নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাওয়া। অরুন্ধতা ভাবলে, এ ভাবে সুবিমলের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকা, সে আরো লজ্জা। তার চেয়ে মা'কে বলবে, নিজে তো আর গুছিয়ে বলতে পারবে না, এবার যেদিন সুবিমলদা আসবে সব স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও মা।

এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সমস্ত দুপুরের শ্রমক্লান্তি মুছে ফেলবার জন্যে জেটি, জাহাজ আর সারি সারি নৌকোর দিকে তাকিয়ে, গঙ্গার ঘোলাজলের ধারে ঠাণ্ডা নরম ছায়ায় সুবিমলের পাশাপাশি বসে, বিকেলের বিষন্ন রোদ্দুর-মাখা অনেকগুলো মুগ্ধ-মুহূর্ত কাটিয়ে, অসহন একাকিত্বের ব্যর্থ পথ মাড়িয়ে বাড়ি ফিরলো অরুন্ধতী।

ফিরে এলো।

কিন্তু মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা ভুলে গেলো ও। একটা কপাটে ঠেস দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে একটা খাম তুলে ধরলেন অরুন্ধতীর মা।

—কে খুললো চিঠি? আজকের ডাকে এসেছে? কার চিঠি বুঝতে না পেরে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলো, কিন্তু উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করলো না। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলো আঁকাবাঁকা অক্ষর-গুলোর ওপর। তারপর ধীরে ধীরে বেদনা-থম্-থম্ মুখে বিছানার ওপর এসে বসলো অরুন্ধতী, চিঠিটা মুঠোর মধ্যে চেপে বালিশের ভিতর মুখ গুঁজে দিলো।

সে চিঠি লিখেছে অরুন্ধতীকে। চিঠি নয়; যেন অভিশাপ। আতঙ্কের রাহু যেন।

আশ্চর্য! অরুন্ধতীকে ফিরে চেয়েছে সে। লিখেছে, স্বেচ্ছায় অরুন্ধতী আবার ফিরে আসুক তার কাছে। ফিরে এলে কেউ বাধা দেবে না, আর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে না কোন দারোগা-পুলিশ।

অদ্ভুত! যেন অরুণি ঐ ঘৃণিত দস্যুর বুকে নিজেকে সমর্পণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যেন, অরুণির ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কেড়ে আনা হয়েছে।

আশ্চর্য! অরুন্ধতীকে চিঠি লিখেছে সে।

লিখেছে, অরুন্ধতী যদি ফিরতে না চায়, যদি তাদের প্রেম-প্রীতি বর্ষা রাতের ফানুসের মতো চুপসে গিয়ে থাকে, তা হলে—তা হলে অন্তত তার সন্তানকে যেন অরুন্ধতী ফিরে দেয়। আপন শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে অরুন্ধতীকে ভুলে থাকবে সে।

আর অরুন্ধতী যদি ফিরে না আসতে চায়, তার সন্তানকে যদি ফিরে না দেয়, তা হলে অন্তত একটি দিনের জন্যে, তার নিজেরই শিশুসন্তানকে যেন দেখতে দেয় অরুন্ধতী। কান্নার অনুনয়ে প্রার্থনা জানিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠলো অরুণি, হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিলো। একটা কুটিল আর হিংস্র হাসির রেশ ফুটে উঠলো ওর ঠোঁট ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

সুবিমল আবার এলো আমন্ত্রণ জানাতে। অরুন্ধতী শুনলো, খুশিতে হাসলো, সায় দিলো, বেশবাস প্রসাধন কিছুটা, ছিমছাম শরীরে সুখীয়াল শিশির, হীরেজ্বলা হাসি, লজ্জা আর আনন্দে মেশা মুখ, ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই, হাল্কা পায়ে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী, সুবিমলের সঙ্গে। তারপর, অনেক স্মৃতির মতো একটানা অনেকটা ট্রামের পথ পার হয়ে, শহর উত্তরের জরাজীর্ণ নির্জনতার ক্লান্ত বিষণ্ণ দারিদ্র্যের ঘরে এসে পৌঁছলো ওরা।

বুকে বাতাস পেলো অরুন্ধতী। চোখে রঙীন রামধনু।

টিনের ছাদ। বাঁশের চিক্ দিয়ে বানানো বেড়া। একটু দূরেই মোটর আর যন্ত্রপাতি মেরামতের একটা ক্ষুদে কারখানা। কুলি মিস্ত্রি ধরনের দু'চারজন এখানে সেখানে। অনেক দূরে চটকলের বাঁশি। লাল ধুলোর রাস্তা। ধুলো ওড়ায় দু'একখানা লরী, শব্দ ছড়ায়। তবু, এই মাটি বাতাস অরুন্ধতীর যেন কতো আপন মনে হলো।

—অরুন্ধতী শোনো। বাঁশের ফটক ঠেলতে ঠেলতে অরুণির মুখের দিকে তাকালো সুবিমল। সুবিমলের চোখ যেন বললো ফিসফিস করে, শোনো অরুণি শোনো।

অরুন্ধতী তাকালো চোখ তুলে।—বলবে কিছু ?

—একটা কথা তোমায় বলতে পারিনি অরুণি।

অরুণির সপ্রশ্ন ভুরুর রেখায় বিস্ময় ফুটে উঠলো।

সুবিমল ঠাণ্ডা ধীর স্বরে বললে, মাধু, মাধুরী নেই অরুণি।

—নেই ?

—আছে। কিন্তু, কিন্তু না থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো।

মাধু, মাধুরী নেই? জীবনের সেই এক ফোঁটা বয়স থেকে যাকে গভীরতম বন্ধু বলে চিনছে, সেই অনেক আগ্রহের বন্ধু মাধুরী নেই? রাস্তার বুকে ঘর কেটে দু'বন্ধুতে খেলা, খেলা—ঝগড়া—মিটমাট। আড়ি আর ভাবের বয়স থেকে প্রেমের ঘরে আড়িপাতার বয়স উত্তীর্ণ হওয়া। তারপর কত জ্যোৎস্না-স্নাত রাতের ছাদে দু'জনের উচ্চকিত হাসি, কথা, আনন্দ। ছাদের আলসে ধরে কতো সময়ের স্রোত পার হয়েছে দু'জনে। মনের কপাট খুলে দিয়েছে দু'জন দু'জনের কাছে। সেই মাধুরী নেই, না থাকলেই ভালো ছিলো। কিন্তু কেন? কি হয়েছে মাধুরীর, কি ঘটেছে তার জীবনে, প্রশ্ন করতে পারলো না অরুন্ধতী।

শুধু দেখলো, বুঝলো। কেউ একবারও মাধুরীর নাম মুখে আনলো না। মনে হলো সুবিমলের সংসারের পাতা থেকে মাধুরীর নাম মুছে গেছে। স্মৃতির পাতা থেকেও হয়তো বা। আর তাই অদম্য এক উৎকণ্ঠায়, দুর্বোধ আগ্রহে প্রশ্নের ফেনা জমে উঠলো অরুন্ধতীর মনে। তবু ওর অনুসন্ধিৎসু মন চাপা পড়ে রইলো আর সকলের সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা বলা, কুশল জানাজানির ভাঙা ভাঙা কথার নীচে।

তারপর সুবিমলের মা, ছোট ছোট ভাই বোন, দাদা বৌদি, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, এনামেলের ভাঙা পুরোনো পেয়ালায় চা খাওয়ার স্মৃতিতে নিজেদের দারিদ্র্যের কুণ্ঠা ভুলে, উত্তরের শহরতলীর ঘাস বাঁশ-বুনো ঝোপের মাঝ দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কথা হারালো দুজনেই—অরুন্ধতী আর সুবিমল।

মাধুরী নেই, মাধুরী না থাকলেই ভালো ছিলো।

কথাটা কানের কাছে আবার বেজে উঠলো।

মাধুরী আছে। কিন্তু কোথায়, কেমন ভাবে, কেন! ঠিক

তেমনি আগের দিনের মতই কি এখনো হাসলে গালে টোল পড়ে মাধুরীর? বিয়ে হয়েছে? ছেলেমেয়ে? মনে পড়লো, ছোট্ট ছেলে কাছে পেলে কেমন ফুর্তিতে নেচে উঠতো মাধুরী। আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতো তাকে। কাজ ভুলে যেতো, নাচতো, হাসতো, শিশুর হাসি আর শিশুয়ালি দেখে। নিজের ছেলের জন্যেও কি মাধুরী তেমনি আদর আর যত্ন বুকে বাঁচিয়ে রেখেছে? কিন্তু সুবিমলের কণ্ঠস্বর, মা দাদা বৌদি– সকলের কথায় আশ্চর্য অনুপস্থিতি ঐ একটি নামের। সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া, ভুলতে চাওয়া কেন?

বাড়ী ফেরার পথে শেষ অবধি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না অরুন্ধতী।

বললে, মাধু কোথায়, বললে না তো সুবিমলদা? তার সঙ্গে এতো দেখা করতে ইচ্ছে হয়। সত্যি, কতোদিন দেখিনি বলোতো!

সুবিমল মাথা নীচু করলো, মাথা তুললো, তাকালে এপাশে ওপাশে, যেন কথাটা শুনতেই পায়নি। তারপর ধীরে ঠাণ্ডা গলায় আস্তে আস্তে বললে, মাধুর কথা জিজ্ঞেস করো না অরুণি। ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ো না।

অরুন্ধতী স্তম্ভিত হলো, বিস্মিত হলো। ওর চোখ প্রশ্ন করলো, কেন সুবিমলদা, কি হয়েছে মাধুর?

লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলো সুবিমল। ফিসফিস করে বললে, মাধু—মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

চমকে চোখ তুললো অরুন্ধতী। চোখ নামালো। বিস্ময়ে হতাশায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো ওর, চোখ ঠেলে জল এলো। মাধু, মাধুরী নেই। মাধুরী না থাকলেই ভালো ছিলো। মাধুরী, ওর সেই মনের অন্তরঙ্গ কোণ মলিন হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে।

মাধু খারাপ হয়ে গেছে অরুণি।

ছোট্ট কয়েকটা কথা, কিন্তু এমন ধারালো বর্শার আঘাত অরুন্ধতীকে আর কখনো সহ্য করতে হয়নি।

সুবিমল আবার আস্তে আস্তে বললে, আমরা তখন ট্রেনে। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো সেই রাতে, ট্রেন থেমে গেলো, মাধুকে হারাতে হলো আমাদের।

শিউরে উঠলো অরুন্ধতী। নিজেরই জীবনের একটা পরিচ্ছেদ মনে পড়ার জন্যে নয়, সুবিমলের মনের হদিস পাওয়ায়। ভুল বুঝেছে ও। ঢেউয়ের গায়ে মিনার তুলতে চেয়েছে। এই কি মাধুরীর খারাপ হয়ে যাওয়া? হিংস্র বিদ্বেষে সশব্দে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর। নিজের গোপন গ্লানির ইতিহাস প্রকাশ না করে ভালোই করেছে অরুন্ধতী।

বিদ্রূপে হাসলো না অরুন্ধতী, ফেটে পড়লো না ক্রোধে আক্রোশে। শুধু নিশ্চুপ ব্যথায় সহানুভূতিতে না-ভাবার গভীরে ডুবে গেলো অরুন্ধতী।

সুবিমল তেমনি ফিসফিস করেই বললে, তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না অরুণি। মাধুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর খারাপ হওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না ওর।

আশায় আশায় মুখ তুলে তাকালে অরুন্ধতী।

বিষণ্ণ দেখালো সুবিমলকে।—আমরাই খোঁজখবর করলাম ওর জন্যে। দিনের পর দিন, কতো মাসের পর মাস কেটে গেলো, খুঁজে পেলাম না ওকে। বেঁচে আছে এ কথাও যখন ভুলতে বসেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন খবর এলো, আর তারপরই পুলিশের হেফাজতে ফিরে এলো মাধুরী।

অরুন্ধতী উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে, তারপর?

ম্লান হাসলে সুবিমল, অরুন্ধতীর একখানা হাত চেপে ধরলো হঠাৎ। বললে, ভুল বুঝো না অরুণি, দোষ আমার নয়।

থেমে থেমে বললে, মাধুর পরেও তো তিনটি বোন রয়েছে, মা বললো, মাধুর জন্যে শেষে কি ওদেরও বিয়ে দিতে পারবো না, এত-গুলো জীবন মিছিমিছি নষ্ট হয়ে যাবে, দুর্নাম রটবে সমস্ত পরিবারের?

—তাই মাধুকে তাড়িয়ে দিলে, এই .তা? বিদ্রূপ বেজে উঠলো অরুন্ধতীর গলায়।

—না। লজ্জায় মাথা নীচু করে সুবিমল বললে, সবকিছু গোপন রেখে বিয়ে ঠিক করে ফেলা হলো মাধুরীর। কিন্তু মাধু বেঁকে বসলো। বললে, সারাজীবন ধরে নিজের কলঙ্ক ও লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

—আর তাই বিয়েটা হলো না? আরো তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর অরুন্ধতীর প্রশ্নে।

সুবিমল বুঝলো না। সহজভাবেই বললে, মা আর দাদা মত দিলে, বিয়েটা হয়ে গেলে মাধু জেদ ছেড়ে দেবে, আর জানতে পেরেও ওর স্বামী হয়তো সবকিছু ক্ষমা করবে। কিন্তু হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিলো। বিয়ের পরই সব প্রকাশ করে ফেললে মাধু, আর মাধুকে বা আমাদের কোনো কিছু না জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলো ওর স্বামী।

অরুন্ধতীর চোখের কোণ দুটো জ্বালা করে উঠলো, কঠোর তীব্র ভাষায় কিছু একটা বলে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর। তবু চুপ করে রইলো। কোনো কথা বললে না, শুধু শুনলো সুবিমলের কথাগুলো, নিঃশব্দ পায়ে ঘাস বাঁশ-বুনো ঝোপের ধার দিয়ে লাল ধুলোর রাস্তায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে মাধুরীর জন্যে সমস্ত মন ওর ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলো। সেই অপরূপ লাবণ্য-উদ্ভাসিত মুখের সারল্য মনে পড়ে গেলো। ভাবলে সে যুগের দুর্ভাগ্য এত অসহন কি করে হলো।

সুবিমল আবার ফিসফিস করে বললে, সকলের কাছ থেকেই বকুনি খেলো মাধু। মা বললে, মাধুর যা খুশি সে করুক, কিন্তু অন্য মেয়েগুলোর তো বিয়ে দিতে হবে। সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে হবে তো সবাইকে। শুধু মাধুর জন্যে সমস্ত পরিবারটা তো আর ধ্বংস হতে পারে না। দাদা বললে, তার চেয়ে মাধু বেঁচে না থাকলেই ভালো ছিলো, ফিরে না এলেই পারতো

—স্বেচ্ছায় তো ফিরেও আসেনি সুবিমলদা। অদৃষ্ট মেনে নিয়েই ও হয়তো ভালো থাকতো, তোমরাই তো হৈ-চৈ করে-উঠেছিলে দেশসুদ্ধ। ঘরের ছাদ সারানোর আগেই বৃষ্টির জন্যে হাহুতাশ করেছিলে।

সুবিমল চুপ করে রইলো, অনেকখানি হেঁটে এসে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে থামলো। তারপর শান্ত গলায় বললে, সেই অভিমানেই হয়তো মাধুও চলে গেলো একদিন।

—আর কোনো খোঁজ পাওনি? উৎকণ্ঠা ফুটে উঠলো অরুন্ধতীর স্বরে।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারলো না সুবিমল। ফিসফিস করে বললে, পেয়েছি। আবার খারাপ হয়ে গেছে মাধুরী।

মনের অন্দরে বিদ্রূপের হাসি হাসলে অরুন্ধতী। তুমিই না বলেছিলে সুবিমলদা মানুষের মনটাই সবচেয়ে বড়ো। তবু তোমরা, মাধুর স্বামী—সকলেই ভয় পেলে কেন?

—মন তো শরীরের বশ, অরুণ। শরীর অশুচি হলে···কথা শেষ করতে পারলো না সুবিমল।

আর অরুন্ধতীর মনে হলো, নীতিবাগীশ কোন গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের কথা শুনছে সে। বয়েস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা—যতো পৃথকই হোক, সব মানুষের বুঝি-বা একই মন।

না। তার চেয়ে এমনি অসহ্য আত্মদাহই জীবনের সম্বল হয়ে

থাক। সুবিমলের কাছে আর ফিরে যাবে না অরুন্ধতী, ফিরে যেতে পারবে না।

কতো, কতো দিনের পর দিন, আর রাত নিঘুম চিন্তার জ্বালে, অশান্ত জ্বালায় কাটিয়ে দিলো অরুন্ধতী। আর তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে বুকে এসে বিঁধছে এক নতুন কাঁটা। বিষাক্ত জ্বালায় জ্বলছে পুড়ছে অরুন্ধতী, অনুপায় আক্রোশে।

তার চিঠি!

অনুনয় উপরোধের চিঠি। ও শুধু ঘৃণা আর ব্যর্থ ক্রোধ পুষে রেখেছে যার বিরুদ্ধে, যে ওর জীবনের চোখে টেনে দিয়েছে কলঙ্কের কাজল, তার চিঠি। তার প্রার্থনা। কাঁটার মতো এসে বিঁধছে অরুন্ধতীর বুকে।

অরুন্ধতী ফিরে এসো। ফিরে দাও আমার শিশুকে। অন্তত একটিবারের জন্যে তাকে দেখতে দাও অরুন্ধতী।

অনুনয়! শুধু আক্রোশ আর বিদ্রূপ জমা হয়ে আছে অরুন্ধতীর মনে।

এর চেয়ে কতো আন্তরিক উপরোধ ঢেলে দিয়েছিলো অরুন্ধতী, সেই নৃশংসতার পায়ে। কতো কান্নার সজল চোখ মেলে মন ভেজাতে চেয়েছিলো ও, পাশবিকতার পা জড়িয়ে ধরে ভেবেছিলো সে পায়ের শিরা-উপশিরায় বুঝিবা মানবতার রক্ত আছে।

অরুন্ধতীর এতো অশ্রুর স্পর্শে সহানুভূতির পাষাণ একটুও নরম হয়নি সেদিন।

সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে আতঙ্কে হিম হয়ে যায় সারা শরীর। দিনের পর দিন অত্যাচার, আঘাত, অপমান। অরুন্ধতীর সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে, সম্মান-সম্ভ্রমের দেওয়ালে ফাটল ধরিয়েছে সে, মুখ তুলে কথা বলার সব স্বাধিকার কেড়ে নিয়েছে।

তারপরও জানিয়েছে সে অনুনয়ের প্রার্থনা একটার পর একটা।

তারই চিঠি!

মনে মনে আবার হাসলো অরুন্ধতী, হাত বাড়িয়ে নিলো চিঠিটা, কি যেন ভাবলো, পড়লো।

সে একই চিঠি নয়, একই প্রার্থনা নয়।

চিঠি নয়। আসবে সে, রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে আসবে। একটি মাত্র অনুরোধের হাত বাড়িয়ে সে আসবে। নিজের জন্যে এই গোপনতা নয়। অরুন্ধতীর সম্মান আহত হবে এই ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে আসবে সে।

অরুন্ধতীকে ফিরে চায় না সে। জানে, অরুন্ধতীকে ফিরে পাবে না।

তার আপন সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে। জানে, ফিরে পাবে না তাকে অরুন্ধতীর কাছ থেকে।

শুধু একটি বারের জন্য, একটি মুহূর্তের জন্য গলির মোড়ের গ্যাস-পোস্টের তলায় এসে দাঁড়াবে সে, অপেক্ষা করবে। শুধু একবার দৃষ্টির দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে তার আপন শিশুসন্তানকে।

আর কিছু নয়, আর কোন উপরোধ প্রার্থনা নয়।

তবু উপহাসে কৌতুকে বিষাক্ত হাসি ফুটলো অরুন্ধতীর মুখে।

না, ক্ষমা করতে পারবে না অরুন্ধতী। সুবিমলকেও নয়।

একজন শুধুই ঘৃণা পেয়েছে অরুন্ধতীর, আরেকজন অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে।

সব ইতিহাস জানা হলে অরুন্ধতীকেও দূরে সরিয়ে দেবে সুবিমল। ভালবাসার, শ্রদ্ধার, সম্মানের আসন ফিরে পাবে না ও।

তবু শুধুই পথ খুঁজলো। চিন্তার জালে চোখ হারালো। চঞ্চলতায় মন।

তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনের সূর্য আকাশে উঠলো, দিগন্তে ডুবলো আর অশ্রুতে ভাসলো অরুণির মন। কি আশ্চর্য! সমস্ত দিন, সমস্ত সন্ধ্যা অরুণি শুধু ভাবলো আর ভাবলো।

এতোদিনের ব্যর্থ আক্রোশ মেটাবার দিন এসেছে। জীবনের চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে অরুণি।

প্রতিশোধ নেবার তীব্র অধীরতায় রক্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যেন। যে শুধু ঘৃণাই পেয়েছে আর যে শুধু ঘৃণাই দিয়েছে অরুন্ধতীকে, আজ এই চরম মুহূর্তে তাদের দুজনকেই যেন হিংস্র আনন্দে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও।

জাফরানী দিন বিকেলে নামলো, লাল বিকেল শিশুসন্ধ্যায়। না-বাতাস না-আলো এক-জানালার নিরালা ঘরের কোণে অন্ধকার গাঢ় হলো, পথ নির্জন। শহরের রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলোয় আরো আঁধার ঘন হলো, ঘন ধোঁয়া, ধোঁয়া নীল বাঁকা গলির বাঁকে। তারপর লোক এলো, মই কাঁধে। বাতিজ্বালা লোক।

আলো নয়। ছায়া দিলো গ্যাসবাতি। রহস্যের, আতঙ্কের।

রাত্রি বাড়লো। নির্জনতম পথ।

একটি একটি করে চারিপাশের জানালার আলো নিভলো, শব্দ থামলো, ঘুম নামলো চাঁদ ঢাকা পাঁচ-তলা বাড়ির কার্নিশে কার্নিশে।

দশটা বাজার ঘণ্টা ভেসে এলো দূরের ট্রাম ডিপো থেকে। অধৈর্য হয়ে উঠলো অরুন্ধতী। অপেক্ষার সীমান্তে এসে পৌঁছলো ও এতোক্ষণে।

সমস্ত বাড়ির ঘুম-নিঝুম মেঝের ওপর পা টিপে টিপে সন্ত্রস্ত চোখে চতুর্দিকে তাকালো অরুন্ধতী। তারপর ঘন গভীর কালো শাড়ির আড়ালে সমস্ত শরীর ঢেকে ফেললো অরুন্ধতী, আর কালো ঘোমটার আড়ালে গ্যাসের ফিকে জ্যোৎস্নায় অরুন্ধতীর

সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখালো। আরো বিষণ্ণ, করুণ। তবু ঐ তীরতীক্ষ্ণ চোখের কোণে কোথায় যেন বিষনিঃশ্বাস।

আপন শিশুকে কোলের কাপড়ের আড়ালে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। মেটে কান্নায় অন্ধকার শীর্ণতম পথটুকু পার হয়ে গলির মোড়ে গ্যাসপোস্টের দিকে পা বাড়ালো অরুণি।

দূরের দৃষ্টিতেও তাকে চিনতে পারলো অরুন্ধতী। দেখলো, অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছে সে। আশায়, হতাশায়।

অরুন্ধতীর কালো ঘোমটার তন্বী শরীরে কি চিহ্ন ছিলো কে জানে, মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মুখ, এগিয়ে এলো সে।

—চলো।

স্পষ্ট গলায় বললে অরুন্ধতী, আর বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চোখ তুললো সে। কী বলছে অরুন্ধতী? সে শুধু একটি মুহূর্তের দর্শন চায়, তার আপন সন্তানের। আর কিছু নয়।

চলো।

আবার বললে অরুন্ধতী।

—ফিরে যাবে? ফিরে যাবে অরুন্ধতী? অবিশ্বাসের ম্লান মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে, জানতাম। জানতাম অরুন্ধতী তুমি ফিরে আসবে।

ফিরে আসবে! বিদ্রূপের হাসি দুললো অরুন্ধতীর চোখে। সে তো ফিরে যেতে চায় নি, সমস্ত পৃথিবীই যে ফিরে চলেছে। পিছনের পথে তাকে, সব মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।

তিন তারা

কাঠের জাফরিটা চিকের পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। দড়িটা ধরে টান দিলে চিকটা গুটিয়ে গুটিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। সকালে ওঠে, দুপুরে নামে। বিকেলে তোলা হয়, সন্ধ্যেবেলায় নামানো।

তখন সূয্যি উঠেছে। ভোর ভোর ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে এ-সময়। সামনে টুকরো ছোট বাগানের খুচরো ফুলের স্নিগ্ধ সুগন্ধে ঘর ভরে যায়। সারা বাগানে ফুল বলতে যদিও ঐ একটি শিউলি ফুলের ঝাড়।

প্রাতঃস্নানে কাবেরীর নেশা। এই ভোর সকালে স্নান সেরে এসেছে ও। মুখের ওপর ভিজে গামছাটা আর একবার বুলিয়ে নিয়ে শাড়ি বদলাতে বদলাতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। চটপট চুলটা আঁচড়ে নিলে, আঁচলটা গুছিয়ে।

ওঘর থেকে ডাক এলো। আঁচটা ধরেছে কাবু ?

—কোন সকালে। জল বসিয়ে দিয়েছি। পেয়ালা-পিরিচগুলো ঠিক করতে করতে কাবেরী উত্তর দিলে।

ওদিকে জাফরি ঢাকা চিকের পর্দাটা টেনে তুলে দিলেন রাজেনবাবু। জাফরির গায়ে গিঁঠ মেরে এঁটে দিলেন দড়িটা। তারপর কপাট খুলে বাইরের বাগানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দূরের রেললাইনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। জরিপাড় জামদানির মতো সমান্তরাল একজোড়া রেখা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁক ঘুরেছে। মোড়ের মাথায় লম্বা-হাত সঙ্কেত। সিগন্যালের পাখনাটা

ঝুলে প'ড়ছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা আসবার সময় হয়ে গেছে বোধ হয়।

রাজেনবাবু বাইরে থেকেই হাঁক দিলেন কাবেরীকে।—ছোটো কুঠুরির তাকে দাঁতনের কাঠি আছে, দিয়ে যা তো কাবু।

—যাই বাবা। কাবেরী উত্তর দিলে ভিতর থেকেই।

হাল্কা বাতাসে জানালার পর্দাটা উড়ছে পৎপৎ করে।

বাইক চালিয়ে লাল কাঁকরের সড়ক মাড়িয়ে কে যেন আসছে। মাথায় ঝুঁটি-ঝোলানো লাল টুপি।

—আজ কি বেরুবে নাকি?

স্ত্রীর কথায় ফিরে তাকালেন রাজেনবাবু। তার হাত থেকে নিলেন দাঁতন কাঠিটা। তারপর বললেন, আমি একদিন না বেরুলেও খেতে পাবো, কিন্তু রুগীদের কি হাল হবে?

চায়ের পেয়ালা হাতে কাবেরী এসে হাজির হলো।—চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!

—ও, আচ্ছা দে চা-টা, খেয়েই নিই।

কোন এক পুরোনো দিনের জের টেনে ব্যঙ্গের স্বরে কাবেরীর মা বললে, সেই ভালো, দাঁত পরে মাজলেও চলবে।

চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে আন্‌মনা চুমুক দিলেন রাজেনবাবু, স্ত্রীর ব্যঙ্গোক্তি কানে গেলো না। মনে মনে তখন হয়তো রুগীদের তালিকা তৈরী করছেন। কোত্থেকে কোথায়, কার বাড়ি থেকে কার বাড়ি।

আরগাডা কোলিয়ারীর ডাক্তার রাজেন বসু।

হাতযশ যথেষ্ট। যুদ্ধের বাজারে যখন কোথাও এতোটুকু সত্যিকারের ওষুধ মিলতো না, রুগীরা যখন জেনেশুনেই নিয়ে যেতো শুদ্ধি-জল আর চিরেতার গুঁড়ো মেশানো ময়দা, তখনও রুগীরা ওঁর বিদ্যেকে বাহবা দিয়েছে।

ওঁর ওপর অটল বিশ্বাস সাঁওতাল কুলিকামিনদের।

তারা বলতো, তুই বামু গুণ করতে জানিস, উদের মতন খুন করিস্ না তুই।

—হয়েছে হয়েছে! টাকাটা দে দিকিনি। আর ওষুধের দাম সাড়ে ছ' আনা। রাজেনবাবু একটু রূঢ় হবার চেষ্টা করেই বলতেন।

শুধু আধাবুনো মেয়ে-মরদরাই নয়, য়্যাংলো মেয়ে আর বাঙালী-বাবুদের মধ্যেও ওঁর প্রশংসা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে নি।

হাবেভাবে দেখাতে চান, উনি শুধু টাকাই চান, গুণগান নয়। কিন্তু টাকার চেয়ে সুনামটাই তাঁর কাছে বড়ো। সুনাম পেয়েছেনও সবার কাছে, এক অমিতাভ ছাড়া আর সকলের কাছেই।

কাবেরীর মামা অমিতাভ, অর্থাৎ রাজেনবাবুর শ্যালক। থাকে কাছাকাছি, কাছের স্টেশন বরকাকানার এ-এস্-এম্ সে। চেনাজানা কারও জীপ্ একখানা হয়তো আসছে এদিকে, অমিতাভ চড়ে বসলো। হপ্তায় এমন দু'একদিন আসবেই সে, দিদির খোঁজখবর নিতে।

খোঁজখবর নিতে, না ঝগড়া করতে।

অপরে যেটুকু বা গুণগান করে, উপেক্ষা করে যায় অমিতাভ। বলে ভগ্নীপতি হিসেবে ইউ আর এ ফাইন ম্যান, তা বলতেই হবে। কারণ, বাবার বুদ্ধি কম ছিলো এ-কথা তো বলতে পারি নে। তবে, ডাক্তার হিসেবে,···ফুঃ।

রাজেনবাবু বলেন, ইংরেজিতে বলে বাটলারের কাছে হিরো হওয়া যায় না। তা 'শালা' কথাটারই ইংরেজি হলো বাটলার।

কাবেরীও মাঝে মাঝে মামার ওপর চটে যায়। অমিতাভর কথাবার্তা ওর মোটেই ভালো লাগে না।

হঠাৎ হয়তো কোনোদিন এসে প্রথমেই জিগ্যেস করে, তোর বাবা আজকাল রোগ সারাচ্ছে না রুগী সরাচ্ছেরে কাবু?

হাসি পায়, রাগও হয়।

কাবেরী বলে, মালগাড়ী থেকে জিনিস সরানোই কাজ কিনা তোমার।

যে যাই বলুক, কাবেরী জানে, এ তল্লাটের রাউত রয়তাইন থেকে সাহেবসুবো অবধি সবাই রাজেন ডাক্তারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রাঁচী আদালতের জজসাহেবও 'বাসিনী মার্ডার কেসে' রায়ের ফাঁকে বলেছিলেন, ডক্টর আর এন বোসের কথা স্টার্লিঙের চেয়ে খাঁটি।

দারোগা রামশরণ পাণ্ডে সবেরি তলবে যাবার পথে খোঁজ নিয়ে যায় প্রায়ই।—নমস্তে ডগ্‌দারসাব। তবিয়ৎ ভালো তো!

এটুকু খোশামোদ করতেই হয়, চলতে হয় একটু ওঁর খেয়ালখুশী মাফিক। খুন জখমী হলে চাপাচুপি তো দিতে হয় প্রায়ই, তখন রামশরণ আগেভাগে রাজেনবাবুকে নিয়ে যায় রামগড় নয়তো রায় স্টেশনের কোথাও। দেহাতী ভায়ের অসুখের নাম করে। ফাঁকতালে ছোট দারোগা হাতুড়ে য়্যাসিস্টেন্ট আয়ারকে নিয়ে যায় ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য। 'ডেথ ফ্রম হাই ফিবার' উইথ হেপাটিক ইন্‌সাফিসিয়ান্সি'—রিপোর্ট লিখে নীচে সই মারে কে এস্ কে আয়ার এল্ এম্ এফ., য়্যাসিস্টেন্ট সার্জেন, আরগাডা কোলিয়ারী হস্‌পিটাল।

দারোগা রামশরণের সঙ্গে রাজেনবাবু ফিরে আসেন রুগী দেখে।

দূরের শ্মশানে চিতার আগুন তখন জ্বলে শেষ হয়ে এসেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দুলে দুলে। সেদিকে তাকিয়ে মৃতের খবর জিগ্যেস করেন রাজেনবাবু। উত্তর আসে, ছোট কুল্‌লি গারোল বিলাসিয়া। ডায়েড অফ ফিবাররো।

লাতেহারের পশ্চিমে বুনো পাহাড়ের রেঞ্জ। দীর্ঘশীর্ষ একক

পালামৌ পাহাড়কে ঘিরে অজস্র পাহাড়িকার হাট। নৃমুণ্ডমালিনীর কণ্ঠমালার মতো। শ্যামলিমায় ঢাকা দূরের দিক্‌চক্রবাল টেনেছে শাল-শিরীষের ঘনবন ঘনিষ্টতা, পাহাড়ে পাহাড়ে। সুকেশা তরুণীর সুপুষ্ট বেণী বেয়ে রুপোলী রিবনের মত নেমেছে রূপঝিল নদী। দূরের দৃষ্টিতে দেখায় যেন কোন এক প্রাগৈতিহাসিক ঐরাবতের আশ্লেষে ঘুমন্ত অজগরের কঙ্কাল।

ঝির ঝির শব্দের নূপুর বাজিয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। ঘুঙুরের বোলের মতো বেদনাবাদন বেজে ওঠে নুড়িতে নুড়িতে ঠোকা খেয়ে। জলতরঙ্গের চূর্ণ শব্দের নিক্বণ শোনা যায়, পাথরের গায়ে জলের ঘা বাজে। অনেক দূর থেকে কলহাস্যে ভেসে আসা মুখর কাকলীর মতো কলধ্বনি তুলে নেচে নেচে আসে রূপঝিলের স্রোত। শৃঙ্গারনটীর ভীতচকিত কৌতুকের লাস্য ফুটিয়ে।

নীচের কালভার্টে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে এক পাল কুমির নেমে আসছে। হ্যাঁ, বছরে আট মাস এক পাল কুমির রূপঝিলের জলে গা ভাসায়।

কুমির নয় কাঠ।

ছিটে বেড়ার পাশে আঙিনায় বসে বসে কাঁচা তামাকের বিড়িতে টান দেয় শাঁওন। আর দেখে, সারি সারি লোক চলেছে জঙ্গলের দিকে, মাঝাং পাহাড়ের পথে।

ঘাসের বিঁড়েতে মুর্গীর ডিম সাজাতে সাজাতে লখিয়া বলে, যাওনা একবার তাঁবুর দিকে। কামধাম মিলে যেতে পারে।

নিরুৎসাহের হাসি হাসে শাঁওন। বলে, শালা ডরপুকের দল, দাগী আসামীর নাম শুনলে ভয় পায়।

—তবু একটু তদ্বির করেই দেখো না একবার।

—তগ্‌দীর থাকলে তদ্বির লাগে না রে লখিয়া। উত্তর দেয় শাঁওন।

লখিয়া চটে যায়।—তগ্‌দীর আর তগ্‌দীর। ভগ্‌বান কি তোমায় ছপ্পর ফেড়ে দৌলত দিয়ে যাবে নাকি?

শাঁওন উত্তর দেয় না। হাসে। আর তাকিয়ে থাকে ওর কুঠির সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যে সর্পিল মেঠো রাস্তার রেখাটি, তার দিকে। কাঁধে লাঠি উঁচিয়ে, লাঠির ডগায় সংসার বেঁধে ক্যাঙারুর মতো কুঁজিয়ে ছুটে চলেছে সকল! রূপঝিলের দিকে, রূপঝিল ছাড়িয়ে বুনো পাহাড়ের বাঁকা রাস্তা ধরে শাল-শিমুলের বনের পথে।

নীচের উপত্যকা নীচে ফেলে রেখে, পাহাড়ের ওপরে, আরো ওপরে উঠলে মিলবে কুলিকামিনদের কণ্ঠকাকলী। নীল গাইয়ের খুরের শব্দ আর চিতাবাঘের চিৎকার থেমে গেছে সেখানে। মধু-লোভী ভালুকের দল হয়তো অভিমানী জড়বৃদ্ধের মতো কুঁজো হয়ে দূরে সরে চলেছে ভীতত্রস্ত দু'পায়ে ভর দিয়ে। ঘাসে মুখ লুকিয়েছে খরগোশের সারি, ঝোপের আনাচে তিতির আর বুনো-হাঁস। কাক চিল শালিকের পাখা ঝটপটানি থমকে দিয়েছে হাজারো রোজমজুরের দল।

জঙ্গল সাফ করতে নয়, গাছ কাটতে এসেছে ওরা। কাঠ কাটতে।

মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গল ইজারা নিয়েছে এবার ব্রিজলাল। আরগাড়ার কয়লাখনিতে কুলি জুগিয়ে এসেছে যে এতোদিন, আজ তার কুঠির ফটকে পড়েছে কাঠের ফলক! গোটা গোটা হরফে লেখা নামটার নীচে স্পষ্টাক্ষরে খোদাই করা দুটো ছোট্ট কথা। টিম্বার মার্চেন্ট।

তিন হাজার টাকা সেলামী আর বছরে বারো হাজার টাকা বনকরের বিনিময়ে পেয়েছে সে মাঝাং পাহাড়ের ইজারা। শাল আর শিশু, আমলকী আর মহুয়া গাছের ভিড় বনে বনান্তরে।

সেদিকে চোখ রেখে লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখেছে সে। বেওয়ারিশ বনস্পতির গায়ে এঁকেছে আপন শর্ত, পেয়েছে রত্নগুহার সন্ধান।

শুধু ব্রিজলাল নয়, আরও অনেকে। দৃষ্টির দিগন্তে তারা দেখতে পেয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাদের বহুবর্ণী রঙবীন চাখে !

ডেরাতে ডিহিতে খবর পাঠিয়েছে ব্রিজলাল। ডুগডুগি বাজিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ওঁরাও আর মুণ্ডাদের আড্ডায়।

কুলি চাই। জঙ্গলের গাছ কাটতে, চেরাইয়ের কাজ করতে। আর ভার বইতে। কাটা গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দিতে হবে রূপঝিলের জলে। মহুয়ামিলনের পোলের নীচে বাঁধা আছে তারের জাল। কুমিরের মতো পিঠ ভাসিয়ে নেমে আসবে কাঠের স্তূপ। সেখান থেকে লরীতে বোঝাই হয়ে আসবে লাতেহারের সাইডিংয়ে। তারপর, কোলকাতা করাচী, মাদ্রাজে মালাবারে !

কুলি চাই। চাই জনমজুর।

দিনে বারো আনা মজুরী আর আধ সের চাল নয়তো গম। বছরে এক জোড়া কাপড়, একখানা দোসুতি-গামছা। মেয়েরা পাবে আট আনা।

মরা গাঙে জোয়ার ডাকলো যেন। দেহাতীদের মনেও। কাজের মতো কাজ জুটেছে। এবার আর যেতে হবে না দূরের কোলিয়ারীতে। কেঁচোর মতো মুখ গুঁজতে হবে না কাদায় আর জলো মাটিতে। নামতে হবে না পাতালের গহ্বরে।

সুস্থ সুখোজ্জ্বল চোখে ছুটে চলে ওরা। এক দলের পর আরেক দল। ম্যানেজারের তাঁবুর দিকে। পুরুষ আর মেয়ে, বাচ্চা আর বুড়ো।

শাঁওনের কিন্তু সেই কথা। নিজে নড়ে চড়ে বসবে না,

কোসিস করবে না, কমুর অন্তের। খুনীর খুন যার শিরায় সে যাবে ঐ বাঙালীবাবুর খোশামোদ করতে। ছুব্‌লা আওরাতের মতো খুশামদ ওর ধাতে নেই।

—ছুব্‌লা আওরাত। লাখিয়ার দাঁতের চাপে একটা তাজা ডিম ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। বলে, যেতে হবেনা তোমাকে, রোজার কাজ নেবো আমি, হাত দুটো তো এখনো ভগ্‌বান ছিনিয়ে নেয় নি।

বাধ্য হয়েই যেতে হয় শাঁওনকে। হাজির হতে হয় ম্যানে-জারের তাঁবুতে।

কাঁধের টাঙিটা টেবিলের ওপর দুম্‌ করে ফেলে দিয়ে ঝাঁকরা চুলের ফাঁকে লাল চিরুনিটা শক্ত করে বসাতে বসাতে বলে, নোকরি চাই মানজারবাবু।

হাতের কলমটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালে অনুপম। তারপর শাঁওনের দিকে তাকিয়ে বললে, ক'খানা গাছ কাটতে পারিস দিনে? কাঠ কাটতে পারবি, মাটি কোপাতে?

—ছোঃ। কি যে বলিস মানজারবাবু। ও কাজ করবে ঐ ওঁরাও আর মুণ্ডারা। আমি সান্তাল নই, জাংলী নই। চত্তিশ-গড়ের রাউত আমি।

অনুপম হেসে বলে, তা হলে কাজটা কি করবি? গাছ কাটতে পারবি না, মাটি কোপাতে পারবি না।

শাঁওন বললে, কত আদমীর জান নিয়ে এলাম, গর্দান কুপিয়ে নিয়ে এলাম আমি, আমাকে বলিস্‌ মাটি কোপাতে? আমার নাম শাঁওন গাঙাট।

—ও, তুই বুঝি সেই গুণ্ডা সর্দার? কয়েদ থেকে ছাড়ান পেলি কবে?

শাঁওন হেসে ওঠে। বীভৎস হাসি।

বলে, শালার লাস তো গুম্‌ করে দিয়েছিলাম। তখন শালা

লাল পাগড়ি বললে, চোর, দারু চুরি করেছিস ধনীরামের ভাঁটি থেকে।

অনুপম বললো, চৌকিদারের কাজ করবি ?

—চৌকিদার ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জঙ্গলের পাহারাদার।

—চোরকে চৌকিদার ? হো হো করে হেসে ওঠে শাঁওন। বলে, লিখে নে, তুই মানজারবাবু, করবো কাজ।

শাঁওনকে বিদায় দিয়ে ছুটি পায় অনুপম। হাত পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করে। কাজ শেষ হয়েছে, আরগাডায় ফিরতে পাবে সে আজ। দু'টো দিনের কর্মক্লান্ত অবসাদে শরীর আর মন বিষিয়ে আছে। টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে নিশ্চুপ পড়ে থাকে কিছুক্ষণ। মনে মনে সুখস্মৃতির টুকরো নাড়াচাড়া করে বারবার। কাবেরী বোধ হয় পরপর দু'দিন ব্যর্থ আশা নিয়ে দাঁড়িয়েছে বাড়ির বাঁকে। অপেক্ষা করেছে। কাবেরী, কাবেরী। চমৎকার মিঠে নাম, কী যেন এক অজ্ঞাত মোহ আছে নামটার মধ্যে। ব্রিজলালের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ! এতো তাড়াহুড়ো না করে, একটু সময় থাকতে বলে না কেন লোকটা। কাবেরীকে একটা খবর দিয়ে আসতে পারতো তা হলে।

কাবেরী আজও ছুটে এসেছিলো। ভোরের ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে। এই সময়টাতেই যে অনুপম যায় তার আরগাডার আপিসে। কোলিয়ারী আপিসের গায়ে ব্রিজলালের গদি। সেখানে। তাই প্রতিদিন এ সময়টায় ঘনঘন ছুটে আসে কাবেরী। দেখতে আর দেখা দিতে। ফুরসত পেলে দু'চারটে কথাও বলে নেয়।

শিবলিঙ্গের মত গোল আর মসৃণ একটা একক পাহাড়। তারই পাশ দিয়ে ওঠে সকালের সূর্য। রাঁচী হাজারীবাগ, লাপ্‌রা

আরণ্যভার সেই বিরল সূর্যসৌরভ দেখা দেয়। আর লাল মাটির প্রান্তর—পায়ের তলা থেকে পিছলে গিয়ে মেশে মেঘের চিবুকে। লম্বা মাঠ, গেরুয়া মাটির মাঠ। আর মাঝে মাঝে শস্যশ্যামল সবুজের দ্বীপ। ভুট্টার ক্ষেতে ভুখা বাচ্চার কান্না। নয়নারাম সবুজের স্বপ্নে ঘেরা মাঠ, আর তারও ওপারে বনশ্যামলী। মাদার আর মহুয়ার গাছ। শাখার ফাঁকে সূর্যশল্প। ওপরে আকাশে মখমল। সাটিনের চাঁদোয়ায় রক্তবর্ণ এক লালের রেকাবি।

এতো যে চিত্তচমৎকারী পৃথিবীর রূপ তা দেখবার সুযোগ মেলে না কাবেরীর বরাতে। যতো কাজ তার এই সময়টিতে। এক টুকরো অবসর, এতোটুকু অবকাশ যদি মেলে তো কাবেরী ছুটে আসে খিড়কির উঠানে। রূপ দেখতে। পৃথিবীর? কে জানে, হয়তো বা রূপ দেখাতে!

অনুপমের দেখা মিলছে না কেন? কাবেরী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় সদর দরজার দিকে গিয়ে দাঁড়াতে। হয়তো কাবেরীর চোখ এড়িয়ে কোন ফাঁকে পার হয়ে যায় খিড়কির দিকের মোড়টা। সদরে দাঁড়ালে তবু অনেকখানি পথ চোখে পড়ে, এতো অল্প সময়ের মধ্যে উধাও হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সদর আগলে বসে আছে কাবেরীর বাবা।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এ সময়ে এসে বসবেন তিনি বাগানে। হ্যাঁ, প্রতিদিন। বাঁশের বাতা দিয়ে ঘিরে ছোট্ট এক টুকরো বাগিচা রচনা করেছেন রাজেন ডাক্তার। মধুমল্লিকা বা রজনীগন্ধার রসমাধুর্য উপভোগ করার জন্যে এ বাগানের উৎপত্তি নয়। হ্যাঁ, কোণের দিকে একটা শিউলি গাছ আছে বটে। তবু কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, বেগুন আর টমাটোর চাষ করেছেন রাজেন ডাক্তার এই ছোট্ট বাগানে। ফুলকপির চারা লাগিয়ে দেখেছে, পোকায় খেয়ে দেয়।

রাজেনবাবুর চোখে মা[illegible]র চেয়ে বার্তাকু উপবনটা আরও বেশী মোহনীয়। তাই প্রতিদিন ভোর সকালে দাঁতে নিমকাঠি ঘষতে ঘষতে এসে বসেন তিনি এখানে। বাগানের মাঝখানটায় একখানা ভাঙা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে।

পাহাড়ের পাশে রেল লাইনের শেষ দিগন্তে যেখানে ইস্পাতের চকচকে লাইন ছ'খানা গিয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে, যেখানে উড়ছে মেটে পাখনা শঙ্খচিলের সারি, যার ওপাশে উঠছে লাল— না, এতক্ষণে পীতাভ হয়ে এসেছে সূর্য, ছোটো হয়ে এসেছে— সেদিকে তাকিয়ে ঠাওর করতে পারলেন না রাজেনবাবু, ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা নেমে পড়েছে কি না। হঠাৎ-রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

কেদারাটা টেনে বসতে যাচ্ছিলেন, ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন।

—কে ইদ্রিস? কী খবর?

কালো ঝুঁটি ঝোলানো লাল টুপিটা এক হাতে ধরে বাইকটা বেড়ার গায়ে রেখে খামে মোড়া চিঠিটা দিলো ইদ্রিস।

চিঠিটা পড়ে বললেন, আচ্ছা। যাবো একটু পরে।

ইদ্রিস চলে গেল।

কাচা কাপড়টা তারে মেলে দিতে দিতে কাবেরীর মা বললে, চেয়ারের হাতলে একটা শাড়ির পাড় ছেঁড়া বাঁধা রয়েছে দেখতে পেয়েছো?

—হ্যাঁ,এখানটা ভেঙে গেছে বলে বেঁধে রেখেছি।

—বেশ করেছো, ওটা ফেলে দিয়ে এসো।

—কেন?

—ওকে ছুঁয়ে চিঠি নিলে না?

আর কথা বাড়াবার সাহস হলো না রাজেনবাবুর। পাড়টা খুলে ফেন্‌সিংয়ের ওদিকে ফেলে দিয়ে এসে বসলেন।

—মন্টুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে হবে, মনে আছে তো ?

—সময় পাই তো যাবো।

—সময় পাই তো মানে ? কতোটুকু সময় লাগবে দেখা করে আসতে ? সংসারের এটুকু কাজও হবে না তোমাকে দিয়ে ?

—সংসারের কাজ না হাতি। কে না-কে, মামার মেসোর ভাইজি—

কথাটা শুনে চটে গেল কাবেরীর মা। হুম্‌হুম্‌ করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেলো। মনে মনে হাসলেন রাজেনবাবু। [illegible] ঠাট্টা করে বলেছিলেন চন্দ্রনলিনী নাম না রেখে তোমার নাম রাখা উচিত ছিলো অসুরদলনী। আজ আর সে বিদ্রূপের পুনরুক্তি করতে সাহস পেলেন না।

সময় হয়ে আসছে এদিকে। ওঠবার ইচ্ছেও রয়েছে। কিন্তু আবার চোখাচোখি হতে পারে স্ত্রীর সঙ্গে। তাই বসে রইলেন রাজেনবাবু।

কাবেরীর ডাক এলো একটু পরেই।—বাবা, চান করে নাও।

সাড়া দিলেন না রাজেনবাবু, শুধু গামছাটা কাঁধে ফেলে জলঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—জলখাবার হয়েছে ? স্নান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন কাবেরীকে।

—হয়ে এলো বলে। তুমি চানটা সেরে আসতে আসতে হয়ে যাবে। কাবেরী উত্তর দিলে।

মাথায় গামছা ঘষতে ঘষতে বেরিয়ে এলেন রাজেনবাবু।

—শিবুটা গেল কোথায়, পড়তে বসেনি এখনো ?

কাবেরী উত্তর দিলো, ওঝা বাবুদের বাড়িতে গেছে, চিনি চেয়ে আনতে। দেখি এলো কিনা।

ফুটন্ত সুজিতে খুন্তিটা দুবার নেড়ে দিয়ে বাইরে এলো কাবেরী,

শিবুর খোঁজে। এমনি একটা না একটা ফিকির খুঁজছে ও। দু'মিনিট অন্তর একবার করে উঁকি মেরে দেখে যাবে, অনুপম এলো কিনা।

ফিরে আসতেই অনুযোগ শুনলে কাবেরী।—চিনি ফুরিয়ে গেছে বলিস নি কেন?

মুখ চোখ ঘুরিয়ে কাবেরী বললে, বা-রে। কাল থেকে মা বলছে তো। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না বাবা।

—ও। তা সুখলালকে একবার পাঠিয়ে দিলেই তো পারিস, বরকাকানায় তোর মামার কাছে।

—আজ পাঠাবো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দিস। বস্তা ফুটো করে দুচার সের চিনিই যদি না জোগাড় করতে পারলো তা হলে আর এ-এস্-এম্ কিসের! মুচকি হেসে রাজেনবাবু বললেন।

কথাটা কাকে খোঁচা দেবার জন্যে বললেন, নিজেই হয়তো বুঝলেন না। অনুপস্থিত অমিতাভের উদ্দেশে, না স্ত্রীকে চটাবার জন্যে?

ওদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলে কাবেরীর মা। আড়চোখে মা'র মুখের দিকে একবার, বাবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কাবেরী না হেসে পারলো না।

শিবু ইতিমধ্যে সিগারেটের টিনে এক কৌটা ধার করে আনা চিনি হাতে এসে হাজির হয়েছে। তার হাত থেকে কৌটোটা নিয়ে কাবেরী মা'র উদ্দেশে বললে, মামা তো নিজেই বলে গেলো সেদিন, তবে আবার চটছো কেন?

—চুরি করে, বলেছে তোকে?

—বাবাও তো জোগাড় করার কথা বললো, চুরি বলেনি।

জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে সবে খিড়কির চৌকাঠ ডিঙিয়েছে কাবেরী, অমনি বাধা পড়লো।

—আবার চললি কোথায় ? হুট্‌হাট্‌ করে কেবল বাইরে বেরুস কেন ঘর থেকে ?

কাবেরী অভিমান করে ফিরে এলো।—বেশ, যাবো না তবে। দীনভজনটা পালাক এই ফাঁকে, আমার কি।

—ও। তা যা, সত্যিই পালাবে হয়তো।

—পারবো না আমি, তুমি যাও না।

—মেয়ের আবার অভিমান হলো। বলে গেলেই তো পারিস। মৃদু হেসে মেয়ের অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করে কাবেরীর মা।—তোর ভালোর জন্যই বলি মা, বিদেশ বিভুঁই জায়গা, হাজার রকমের সব লোক—

রাজেনবাবু বললেন, কুটোটি কেটে তো দুটো করতে পারবে না, মেয়েটা খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলো, তার সঙ্গে একটু ভালো ভাবে কথা বলবে, তা নয় দিনরাত খিটমিটি।

স্ত্রী ঝেঁঝে ওঠে।—বকিয়ো না মেলা। অমন বয়েসে আমি বারোটা মুনিষের ভাত রেঁধেছি। শাশুড়ি ননদের খোঁটা খেয়েছি দিনরাত।

—তাই শোধ নিচ্ছো মেয়ের ওপর ?

—কী বললে, শোধ নিচ্ছি ? পেটের মেয়ের ওপর শোধ নিচ্ছি আমি ?

—তাইতো দেখছি। অথচ মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে তো রাতে ঘুমুতে দাও না।

—তবে ? কেন ভাবি, কেন ? মেয়ের ভালোর জন্যে নয় ?

রাজেনবাবু এতোক্ষণে বুঝলেন গলাটা তাঁর একটু চড়া হয়ে গিয়েছিলো। মুখে তাই হাসি টেনে আনার চেষ্টা করে বললেন, সেই কথাই তো বলছি। কাবেরীর জন্যে তুমি যা ভাবো, ওকে

তুমি যতোখানি ভালোবাস তার একআনাও আমি হয়তো পারি না। তবু কেন যে মেয়েটাকে খোঁটা দাও।

—শাসন না করলে মেয়ে 'মানুষ' করা যায় না, তা তুমি কী করে জানবে? সে চোখই কি আছে তোমার!

রাজেনবাবু উত্তর দেন, শাসন করবে বৈ কি, তা বলছি না। মানে এই তেপান্তরে এসে পড়ে রয়েছে বেচারী, একটা বন্ধু নেই বান্ধব নেই, ইস্কুলের মুখ দেখতে পেলো না—

কাবেরীর মা'র মনও নরম হয়ে আসে, ভিজে গলায় বলে, সত্যি, একটা পিঠোপিঠি বোন থাকলেও মন খুলে কথা বলবার লোক পেতো।

বাবা মা তর্ক করুক না, কাবেরী এদিকে অনেকক্ষণ আগেই খিড়কির দোর পেরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও বোঝে, অভিমান করে ক্ষতি ওরই হবে। কোন ফাঁকে হয়তো—দীনভজন নয়—অনুপম পালাবে সুরুৎ করে।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো কাবেরী। রোজই তো অনুপম যায় এ পথ দিয়ে। অন্যদিনের একটা কথা মনে পড়লো। মনে পড়ে কৌতুক বোধ করলে কাবেরী। দূরের কালভার্টটা অবধি গম্ভীর মুখে হেঁটে যায় অনুপম. যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে গেলো এমনি চিন্তার রেখা ফোটে তার কপালে। কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই যেন। তারপর দক্ষিণের তেমাথার বাঁক ফেরবার সময় চট্ করে একবার পিছন ফিরে তাকায়। হঠাৎ কোনো ডাক শুনে বা শব্দ শুনে আচম্‌কা যে ভাবে মানুষ ফিরে তাকায় সেইভাবে। ঠিক এই মুহূর্তটিতে কাবেরীর চোখ থেকে অনুপমের চোখ অবধি একজোড়া অদ্ভুত রহস্যময় সমান্তরাল রেখা টানা হয়ে যায়। পরস্পর পরস্পরের কাছে হয়ে ওঠে অত্যন্ত নিকট। কাবেরীর চোখে অনুরাগ উছলে ওঠে। তারপর, তারপরই অনুপমকে আর

দেখা যায় না। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের কুঠিটায় আড়াল পড়ে সে। আর কুয়াশার মতো এক ক্লান্তির গভীরতা নামে কাবেরীর বুকে।

স্তব্ধ সমুদ্রের ছায়া পড়ে কাবেরীর মনে। দূরের সমুদ্রে নীলাভ দ্বীপের মত ঝাপ্‌সা হয়ে আসে তার স্বল্পসজল দৃষ্টি।

প্রভাতী পুজোর ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু আজও অনুপমের দেখা নেই।

হপ্তায় একটা দিন ঐ কাছের শিবমন্দিরে দেখা হয় দু'জনের, সারা সপ্তাহের আশা আকঙ্ক্ষায় বাঁধা প্রতীক্ষার প্রহর আসবে আগামী কাল। চোখের পরিচয়কে ঘনিষ্টতর করে তোলে ক্ষণবিশ্রম্ভের আলাপ। কিন্তু, আগামী কালের অভিসারলগ্ন হয়তো ব্যর্থ যাবে। কে জানে! আজও দেখা নেই অনুপমের।

ব্যথাতুর চিন্তায় সব ভুলে গিয়েছিলো কাবেরী। হঠাৎ টিন পেটানোর আওয়াজ শুনে চমকে ফিরে তাকালো।

দীনভজন চলেছে সরকারী কুয়োর দিকে। ঘাড়ে বাঁক, দু'পাশে দুলছে দু'টো ফাঁকা টিন—কেরোসিনের। হাতের কাঠিটায় টিনটা বাজাতে বাজাতে চলেছে।

কাবেরী ডাক দেয়।—দীনভজন, দু'ভার জল দিয়ে যাও আগে।

—মাস্টারবাবুর বাড়ি হয়ে গেলেই দিয়ে যাবো, মাঈজী।

—না না, আগে দিয়ে যাও। আসতে অনেক দেরি হবে তোমার, কাজ পড়ে থাকে তোমার জন্যে।

— আচ্ছা, মাঈজী। এক ভার পানি আগেই দিয়ে যাবো।

দীনভজন চলে যায় কুয়োর দিকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কাবেরী ফিরে আসে। বলে, দীনভজনটা কি বলোতো মা? এতো মানা করি তবু মাঈজী আর মাঈজী! দিদি বললেই তোপারে।

স্নেহাতুর চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসে কাবেরীর মা। দূর ভবিষ্যতের কোন এক সানাই রাগিণীর সুর ভেসে

আসে যেন। স্বপ্নসায়রে যেন দানভজয়ে সম্বোধনটুকু সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

উদাস হয়ে ওঠে মন। দৃষ্টিহীন চোখ অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। সামনের পাহাড় ডিঙিয়ে, দূরের দিকচক্রবাল ভেদ করে।

আনন্দে উত্তেজনায় চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সত্যি, কাবেরী বড় ভালো মেয়ে।

দূরের সীমান্ত থেকে চোখ ফিরে এলো, আঁচলে চোখের জল মুছতে গিয়ে আনন্দের হাসিতে ভরে উঠলো সারা মুখ।

বারান্দায় বেরিয়ে এলো ঘরের জানালা ছেড়ে। উনুনের গরমে কাবেরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। তবু একমনে রান্না করছে বসে বসে।

সমস্ত বুক ভরে কাবেরীকে দেখলে, যেন বুকের মধ্যে কাবেরীর শরীরটা টেনে নিলো কল্পনার আলিঙ্গনে, স্নেহে, প্রীতিতে, আশিস-আশ্লেষে।

সুন্দর, অদ্ভুত সুন্দর মনে হলো। দেহের প্রতিটি শিরায় যেন স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে।

না, আর দেরি করা উচিত হচ্ছে না। এ বয়সটাকে, এই রূপের প্রাচুর্যকে ভয় করতে হয়।

আর, আর এই নোংরা কৌরব রাজত্বকে আরো বেশি ভয়।

ছত্রিশটা জাতের মানুষ দিনরাত চলাফেরা করছে বাড়ির আনাচে কানাচে। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো বেপরোয়া উড়ে উড়ে বেড়ায় ছেলেগুলো, কেউ শিস দেয়, কেউ বা চিৎকার করে কানে-আঙুল দেয়ার কথা বলে। বাঙালী তো নয় যে, সম্মান অসম্মানের কথা ভাববে। বাপ মা'গুলোও যেমন সব ছন্নছাড়া! কেউ বেজাতে বিয়ে করেছে, কেউ বা বিয়ে করেছে কিনা তাই সন্দেহ। ছেলেগুলোও দেখে শিখছে, ভালো হবে কোত্থেকে।

আর, ওদেরই বা দোষ কী। কুলিমজুর থেকে কেরানী বাবুরাও তো নকল করছে ঐ সাহেবসুবোদের।

ছি ছি ছি! মনে পড়তেও ঘেন্নায় মন বিষিয়ে যায়। প্রথম প্রথম ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাহেবপাড়া দিয়ে বেড়াতে যেতো ও, কিন্তু ঐ একটা দিনের পরই ওদিকে বেড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েদের চোখে পড়েনি! হায়ালজ্জা বলে কি নেই কিছু ওদের?

না, দেশে হলে কাবেরীর বিয়ে দু'বছর পিছিয়ে গেলেও ভয় পেতো না, ভাবনা হতো না। এখানে এই পাপের রাজত্বে কোন ভরসায় থাকবে।

কিন্তু, দলবল নিয়ে তারা যে মেয়ে দেখে গেলো, কৈ তাদের চিঠিও তো এলো না এখনো।

এক হয়ে মিশে গেছে সকলে।

যন্ত্রের যন্ত্রণা। অক্টোপাসের অজস্রবাহুর বন্ধন যেন এক গোষ্ঠীতে বেঁধে ফেলেছে সকলকে। দেহাতী ওঁরাও, ছত্রিশগড়ের রেজারোজ-মজুর। ব্যাঙ্গালোরের য়্যাংলো আর কাথিয়াবাড়ের সওদাগর। অন্ধ্রবাসী করণিক আর আলিগড়ের খালাসী। সব জাতের আর সব ধাতের মানুষ এসে মিলেছে এখানে। মিশে গেছে।

সাহেবপাড়াটা একটু তফাত হয়ে চলে, একটু কাঁধ বাঁচিয়ে। কৌলীন্য বজায় রেখে। শুধু দু'চার দিন দু'চার মুহূর্তের জন্যে এক স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

হ্যাঁ। ব্রিজলাল আসতে পেয়েছে আজকের মজলিসে। আর অনুপমও। তার কারণ, এ জলসার খরচ এসেছে ব্রিজলালের সিন্ধুক থেকে।

ছোটো সাহেব স্যামুয়েল বলেছিলো, শুধু ডালি গাঁটালেই হবে.

হয় না। [illegible]। তোমার সে আগেকার ম্যানেজার যে এখন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে এডেন পেরিয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার বড়ো কড়া লোক, ইন্‌জাসটিস দেখতে পারে না।

ব্রিজলাল হেসে বলেছিলো, কোসিস্ করলে সাব তুমিই করে দিতে পারো।

—ব্রিজলাল, হোয়াট ওয়াজ এ রেজিং কন্‌ট্রাক্‌ট য়্যাণ্ড দিস ইজ—

—টিম্বার সাপ্লাই, স্যার। অনুপম পুরন করে দেয়।

শেষকালে নাছোড়বান্দা ব্রিজলালকে উপদেশ দিয়েছিলো স্যামুয়েল, একটা ভালো রকমের পার্টি দিতে। হাগিন্স যাতে বোঝে যে, ব্রিজলাল একজন সলিড বিজনেসম্যান। তারপর আঙুর আপেল আখরোটের তলায় আধ ডজন হোয়াইট হর্স নয়তো ব্ল্যাক লেবেল আর তার তলায় পার্চমেণ্টে ছাপা হিজ ম্যাজেস্টির ছবি দেখলে—

কথা শেষ করেনি স্যামুয়েল। ওর অর্থপূর্ণ হাসিই বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছিলো।

তাই। তাই আজকের এই পার্টিতে আসার ছাড়পত্র পেয়েছে ব্রিজলাল। আর অনুপম।

কোলিয়ারীর ইন্‌স্টিটিউট হল আজ আলোয় ঝলমল করে উঠেছে।

রং আর রূপের আতিশয্য, আলো আর উন্মাদনা। ইউটোপিয়া না স্যাংরিলা ?

—লাস্ট ওঅরের সময়, ইটালিতে গণ্ডোলায় বসে একটি মেয়ে গীটার বাজিয়েছিল—

—জুডি গার্লও একজন রিয়াল লেডী হয়ে উঠেছে।

—আমাদের ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ক্লাব হকিতে হেরে গেছে রেলওয়ের সঙ্গে।

—ম্যাক্‌টা দিনকে দিন বড়ো ইউকজোরিয়াস হয়ে উঠছে।

ইনস্টিটিউট বিল্‌ডিঙের সামনে বিস্তৃত ঘাসের লন্। ওপর থেকে

জেবলে চক্রগোল উদ্যানটিকে দেখায় যেন স্টিমারডের মতো।

হাগিন্স বসে আছে নিশ্চুপ। আর, ওর স্থিরনিবদ্ধ চোখ পড়েছে কার এওের ঘাসের পাখার আড়ালে আর একজোড়া কৌতুকী চোখের ওপর।

ব্রিজলাল আর অনুপম চরকির মতো ঘুরছে। তত্ত্বাবধানের ভার যে ওদেরই ওপর। শুধু মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে বিনয়াবনত মস্তকে, হাগিন্সের পিছনে। স্যামুয়েলের ইশারায় কাজ করে চলেছে।

নেশার ঘোর হাগিন্সের চোখে। উঠে দাঁড়াল ও। ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গোল থামটার পাশে।

একে একে আলো নিভে আসছে। যেন বাসরযামিনী মিইয়ে এলো ক্রমশ। আলোর আনন্দ, হাসির হঠকারিতা, রঙের রঞ্জনী নিস্তব্ধ হয়ে এলো।

সবুজ ঘাসের লনে পায়চারি করছে হাগিন্স আর স্যামুয়েল। আর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো এঁটে আছে ব্রিজলাল।

স্যামুয়েল বললে, ব্রিজলাল ওর ফরেস্টে যেতে ইনভাইট্ করছে। একদিন।

—ফরেস্ট? হাসলে হাগিন্স। কি আছে সেখানে? ওক্স্ য়্যাণ্ড পাইন্স, বার্ডস য়্যাণ্ড বীস্টস? আমি পোয়েট নই মিস্টারস্যামুয়েল।

স্যামুয়েল বললে, হান্টিঙে তো যেতে পারেন।

—ইয়েস্। হান্টিং—চমৎকার। আই উড র‍্যাদার।

—চলুন না একদিন ফরেস্টে। সবকিছু ব্রিজলাল য়্যারেঞ্জ করে দেবে।

হাগিন্স চমকে চোখ তুললে। ফরেস্টে? কী আছে সেখানে, কী পাওয়া যাবে?

—বাঘ ভালুক, হরিণ। পর্কুপাইন গিনিপিগ, ওয়াইল্ড বোর্‌স, সবই আছে।

—সশব্দে হেসে উঠলো হাগিন্স।—য়্যানিমেল্‌স ? ওসব আমার হবি নয়।

—পাখি ?

—রিয়াল ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে সে জঙ্গলে ? লাইভ্‌লি গরম রক্তের মেয়ে আছে ?

ব্রিজলালের মোটরখানাকে পাশ কাটিয়ে যাবার রাস্তা করে দিলেন রাজেনবাবু। বাইক থেকে নেমে।

ব্রিজলালও গাড়ি থামাতে বললে কিষণলালকে।

—ডাগদারসাব যে। রুগী দেখতে চলেছেন ?

—না। রূপেয়ার খোঁজে।

ব্রিজলাল হাসলে। মাহাত্‌মাজীও বলতেন, আমি বেনিয়া। পাঁচ পাঁচ রূপেয়া না দিলে দস্ত্‌খত মিলতো না।

রাজেনবাবু খুশী হলেন যেন একটু ! বিদায় নেবার জন্যে বললেন, চলি শেঠজী। কাজ আছে অনেক।

—দশ হাজার বিশ হাজার টাকায় কি শেঠ হওয়া যায় ডাগদারসাব। শেঠজী বলবেন না আমাকে। ব্রিজলাল হেসে বললে। তারপর আত্মগর্বে আপ্লুত হয়ে হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি মুখের ভাব এনে বললে, তবে হ্যাঁ, মাঝাং পাহাড়ের জঙ্গলটা ইজারা নিয়েছি। ভগ্‌বান কিরপা করলে শেঠ বনতেও পারি।

—তাই নাকি ? ভালো ভালো। লক্ষ্মী তো আপনাদের ঘরেই বাঁধা শেঠজী !

রাজেনবাবু বাইকে উঠলেন। কৃত্রিম হাসি হেসে।

ব্রিজলাল বললে, চলুন না একরোজ ডাগদারসাব, শিকার উকারের শোখ থাকে তো। মানিজার হাগিন্স সাহাবও যাচ্ছেন,

আগে হওয়ায়। আপনার লেভ়কা [illegible] নিয়ে চলুন না, বহুত খুশি হবে বাচ্চারা।

প্যাডেল করতে করতে রাজেনবাবু বললেন, আচ্ছা ভেবে দেখি। এদিকে তখন বাঁধানো বেদীটার ওপর দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কাবেরী। সোলার হ্যাট আর সাইকেলের চলন্ত চাকা একটা ছোট্ট কালোর বিন্দুতে মিশে গেলো। পিছনে লাল ধুলো উড়িয়ে গেলো নীল রঙের মোটরখানা।

তন্ময়তা ভাঙলো কাবেরীর। হাতে ভিজে কাপড়টা মেলে দিতে দিতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠলো বুক নিঙড়ে।

—দিদি !

শিবু ছুটে এলো।

কাবেরী সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে, কী রে ? কী বলছিস ?

ঠোঁটজোড়ার ওপর কচি অনামিকার চাপ পড়লো আড়াআড়ি ভাবে। ইশারায় আর চোখমুখের সযত্ন সতর্কতায় শিবু জানালে, চু-প্।

কাবেরী দ্রুত নেমে এসে শিবুকে সরিয়ে নিয়ে গেলো আরেকটু দূরে।

ফিসফিস করে বললে, আচ্ছা দাঁড়া।

চট্ করে ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এসে কাবেরী জানালে, নেই। বল কী বলছিলি।

—অনুপমদা এসেছে।

কাবেরী হেসে বললে, কোথায় ? তোর সঙ্গে দেখা হলো ?

—হ্যাঁ, তোমাকে মন্দিরে যেতে বললে।

—আচ্ছা, বলগে যা একটু দাঁড়াতে। যাবো এখনি।

কাবেরীর স্বরটা একটু হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, শিবু সাবধান করে দিলো।—সৃগু।' আস্তে, মা শুনতে পাবে।

কাবেরী হাসলে।—ডেঁপো ছেলে!

শিবু ছুটে চলে যাচ্ছিলো, কাবেরী আবার ডাকলে।—শোন্।

—যাবো না?

—না, থাক্। দাঁড়া এখানে, আমার সঙ্গে যাবি।

ঘরে ঢুকলে কাবেরী। পুজোর উপচারে সাজানো রেকাবিখানা তুলে মা'র উদ্দেশে বললে, মন্দিরে চললাম মা। পুজোটা দিয়ে আসি।

ভেতর থেকে জবাব এলো, শিবুকে সঙ্গে নিয়ে যা।

—হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি। আয় শিবু। শিবুর উদ্দেশে ডাক দিলে।

চৌকাঠ ডিঙোবার সময় বললে, ডালটা চাপিয়ে গেলাম মা, দেখো যেন পুড়ে না যায়। আর দীনভজন এলো বলো চৌবাচ্চাটা পরিষ্কার করে দিতে।

—আচ্ছা, দেরি করিসনে যেন। মা উত্তর দিলো।

তর্‌তর্ করে দ্রুতপায়ে কাবেরী এসে পৌঁছলো মন্দিরে। এতোটা ঘোরপ্যাঁচ রাস্তা, দু মিনিট সময় লাগলো না তার। তাল রাখতে পারলে না শিবুও।

দূর থেকে চোখোচোখি হলো অনুপমের সঙ্গে। ফিক্ করে হেসে ফেলে পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হয়ে এলো কাবেরীর মুখ। না, এতো সহজে ভোলবার মতো ঠুনকো মেয়ে নয় ও। ঠাণ্ডা প্রকৃতি বলে কি রাগ থাকবে না শরীরে?

হিন্দুস্থানী পুরোহিতের সামনে রেকাবিটা রেখে শিবুকে অপেক্ষা করতে বললে।

সাবধান করে দিলে।—খবদ্দার উঠো না কিন্তু এখান থেকে। যতোক্ষণ না আসি বসে থাকবে।

শিবু ঘাড় নেড়ে মার্বেলের মেঝেতে বসে পড়লো।

কাবেরী সরে এলো মন্দিরের পিছনে, সারা অঙ্গে সিঁদুর মেখে হনুমানজীর মূর্তিটা যেখানে জলজলে চোখে তাকিয়ে আছে, তার আড়ালে।

কাছে আসতেই অনুপম বললে, বাব্বা, পাকা দু'টি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি।

[illegible] ভান করে রইলো কাবেরী। চোখ তুললে না। শুধু আস্তে আস্তে বললে, কথা বলবো না আমি তোমার সঙ্গে।

—সে কি? অনুপম হাসলে।

—হ্যাঁ, কোন সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে।

—যারা দেখতে এসেছিলো, চিঠি দিয়েছে বুঝি পছন্দ হয়েছে বলে?

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকালে কাবেরী, উত্তর দিলে না।

অনুপম বললে, হপ্তায় একটা দিন দশ মিনিটের জন্যে কথা বলতে পাই, তাও যদি মুখ ভার করে থাকো, চলে কি করে বলো তো?

—বেশ তো, না এলেই পারো।

—রাগ করছো, না? কিন্তু দোষটা কী করলাম, তা বলো?

এইবার অভিমানে ফেটে পড়লো কাবেরী। দোষটা কী করলাম! এ দু'দিন ছিলে কোথায় শুনি?

অনুপম ওর কাঁধের দুপাশে দুটো হাত রেখে ওকে কাছে টেনে আনলে।

আঁচলটা তুলে কাবেরীর মাথায় ঘোমটা টেনে দিতে দিতে বললে, বউ হলে তোমাকে ভারি সুন্দর মানাবে কিন্তু।

ফিক্ করে হেসে ফেলেই দাঁতে ঠোঁট চাপলে কাবেরী। কাঁধ থেকে অনুপমের হাতটা নামিয়ে দিলো কপট রাগে।

কাবেরীর নাকটা ঈষৎ টেনে দিয়ে অনুপম বললে, আহা, চটছো কেন, শোনই না কী হয়েছিলো।

—কী হয়েছিলো? বলো, একটা কিছু তো তৈরী করেই এসেছো।

—না গো না। সত্যি বলছি, দু'দিন ধরে জ্বর হয়ে পড়েছিলাম।

—মিছে কথা।

বেশ তো, তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। সত্যি বাপু, তোমার বাবার মতো এমন ডাক্তার দেখিনি। ঠিক্ একটি দাগ ওষুধ খেতে না খেতে—

কাবেরী হেসে ফেললে। বললে, এতোও মন জুগিয়ে চলতে জানো। যাই বলো, আমি বিশ্বাস করছি না তোমাকে।

—সত্যি কিনা টের পাবে দু'এক দিনের মধ্যেই। ভয় দেখানোর স্বরে বললে অনুপম।

—কেন? কী করে টের পাবো?

—জ্বরের ঘোরে তোমার বাবার সামনেই যে তোমার নাম ধরে প্রলাপ বকেছি।

আশঙ্কায় চোখ তুলে তাকালে কাবেরী।—সত্যি? বাবার সামনে?

—হাঁা গো হ্যাঁ।

—ছি ছি ছি। বাবা কী মনে করবে বলো তো। আর মা যদি শোনে—

—ঠেঙিয়ে পা খোঁড়া করে দেবেন তোমার, না?

—হাসছো তুমি? তুমি কী বলো তো? ছি ছি ছি, লজ্জায় আমি—

অনুপম হেসে বললে, ভয় নেই, প্রলাপ বকেছিলাম সত্যি, তবে তোমার বাবার সামনে নয়। একা একা।

—জ্বরের ঘোরে বুঝি জ্ঞান থাকে? কী করে বুঝলে বাবা ছিলো কি না ছিলো?

—তাও তো বটে!

কাবেরী খিলখিল করে হেসে উঠলো এবার।—পাজী। সব মিছে কথা তোমার।

অনুপমও কৌতুকের হাসি হাসলে।

রোদ বাড়ছে। প্রায় দুপুরের আগুনে সব যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই, জনমনুষ্য নেই যেন কোথাও। শুধু কয়েকটা কাককোকিলের নিঃস্ব চিৎকার উষ্ণ হালকা হঠাৎ-ঝড়ের বাতাসে। দীর্ঘশ্বাস যেন। আর পায়ের তলায় বাঁধানো পাথরের আঙিনাও যেন জ্বরাতুর। উষ্ণ। শঙ্কিত অভিসারিকার মতো ব্যর্থ স্পন্দন বাতাসের বুকে। আর ভয়ার্ত নিঃশ্বাস।

মন্দিরের পিছনেই একটা মহুয়া গাছ। পাশেই আরেকটা। তার পাশে আরেকটা।

ওদের পায়ের শব্দে একটা মেঠো খরগোশ ছুটে পালালো।

একটা গাছের তলায় এসে বসলো ওরা দুজনে। অনুপম আর কাবেরী। লতাপাতার ঝোপের ভিতর থেকে একটা বহুরূপী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

—কী ভাবছো?

হেসে চুপ করলো কাবেরী, উত্তর দিলো না।

—দুপুরটা বড়ো একা একা কাটে, না? অনুপম আবার প্রশ্ন করলো।

উদাস চোখ মেলে কাবেরী উত্তর দিলো, আগুন জ্বালাতেই জানো!

একটা ঘাসের শিষ তুলে দাঁতে কাটলে অনুপম।—চাকরি ভালো লাগে না।

—চলো উঠি।

—বসো না আরেকটু। থাক্, চলো।

উঠলো না কেউই। বসে রইলো।

বসে থাকলে চলে না লখিয়ার। শাঁওনের বসে থাকাই কাজ। পাহাড়ের গা বেয়ে ভাঙা পাথরের বাধা ঠেলে ঠেলে নেমে আসছে রূপঝিলের স্রোত। মাঝাং পাহাড়ের আশ্লেষি স্বপ্ন বুকে বুনে চলে পড়ছে রূপঝিল। আর প্রতি পদক্ষেপে তার টুকরো পাথরের পুরুষালি বাধা। পরিরম্ভবিভ্রমার মতো কেঁপে নামছে নির্ঝরতরঙ্গ। সম্ভ্রমালিঙ্গিতা তটিনীর অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ যেন। দোসরের খোঁজে দয়িতা ছুটেছে। পথের বাঁকে বাঁকে ত্রস্তগমনার স্রস্তবসনে অচিন পুরুষের আকর্ষণকে আঘাতে উপেক্ষা করে ছুটে নেমে আসছে রূপঝিল।

ঝর্ণা যেখানে নদী হয়েছে। মাঝাং পাহাড়ের পায়ে ডেরা বেঁধেছে শাঁওন।

আগে কখনও হয়তো এখানে একটা শ্মশান ছিলো। এক-ইঁটের দেয়ালে ঘেরা ক'খানা ঘর, টালিতে ছাওয়া একটুখানি চবুতরা।

কোণের দিকের ঘরখানা চৌকিদারের। শাঁওন আর লখিয়া বাসা বেঁধেছে সেখানে। আর আর ঘরগুলো, চত্বরের চারিপাশ নতুন করে গড়ে তুলেছে ব্রিজলাল। বনপতির আপিস আদালত আবাস সব কিছু। হপ্তায় দুদিন অনুপমকে এসে থাকতে হয় এখানে। তাই ওর জন্যেও আছে একখানা।

মাসে তিন টাকা উপরি শাঁওনের। ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখার ভার লখিয়ার ওপর। পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে ও, তাই

নিজের খুশীতেই করতো কাজটা। আর সেই সুযোগে উপরি তিন টাকার কথা চেপে গিয়েছিলো শাঁওন। লখিয়াকে জানতে দেয়নি।

আজ নাকি ব্রিজলাল আসবে। জঙ্গল দেখতে। সঙ্গে আসবে ব্রিজলালের বন্ধুবান্ধব, বাঙালীবাবু আর কোলিয়ারীর ম্যানেজার হাগিন্স সাহেব।

অনুপম খবর পাঠিয়েছে আগে থেকে।

শাঁওন হাতের লাঠিটা ছুরি দিয়ে চেঁছে সমান করতে করতে বললে, লখিয়া, মানজারবাবুর কোঠি সাফ করে রেখেছিস?

ল্যাজে পা দেয়া সাপের মতো ফোঁস করে উঠলো লখিয়া। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে শাঁওনের দিকে।

ঝাঁঝিয়ে উঠে বললে, কেন? কেনা গোলাম নাকি আমি মানজারবাবুর? আমাকে কি তঙ্খা দেবে হর্ মহিনা, যে ঝাড়ু লাগাবো ওদের ঘরে?

—নিমকহারাম!

—নিমক খাই আমি মানজারবাবুর?

—তো চাউল কেনবার রূপেয়া কে দেয়? ভাজিতরকারি কিনিস কোন টাকায়?

—চৌকিদারীর জন্যে দেয়, ঝাড়ুদার নাকি আমি?

—বক্‌বক্ করিস না লখিয়া। ঘরগুলো সাফ করবি কিনা বল্?

—না। বিবি না বাঁদী আমি তোর, যে হুকুম তামিল করবো?

রাগে দপ্‌দপ্ করে উঠলো শাঁওনের কপালের শিরাটা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উ লো ও।—চুপ বদ্‌মাশ কাঁহাকা।

লখিয়া হাসলে।—চোর আর ডাকু বদমাশ নয়?

ব্যস্। পরমুহূর্তেই অস্ফুট একটা শব্দ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো লখিয়া।

চুপ করে বসে রইলো শাঁওন চৌকিটার ওপর। লখিয়াকে [illegible] চেষ্টা করলো না। ইচ্ছে হলো না লাঠিটা কুড়িয়ে আনবার। লখিয়ার গোঙানিতেও টললো না। মরুক, মুর্দা টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে রূপঝিলের জলে।

কিন্তু মরবার মেয়ে নয় লখিয়া, শাঁওনের হাতে এমন অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে সে এর আগেও। চোটের দাগ শুকুতে লেগেছে দু'চার দিন, ফাটা কাটার ব্যথা যেতে।

তিন বছরের সংসার ওদের। ভালোবাসতেও যেমন উদ্দাম, বাসা ভাঙতেও তেমনি সময় লাগে না লখিয়ার। অদ্ভুত ধাতের মেয়ে।

বিয়ে হয়েছিলো লখিয়ার দলের সর্দার বুড়ো রতনলালের সঙ্গে। তারপর রতনলালের সঙ্গেই বিলাসপুর ছেড়ে এসে রেজার কাজ নিয়েছিলো রেলের কারখানায়। শাঁওনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ওর সেখানেই। পালিয়ে এলো রাঁচী। লোহারডাগায় তখন নতুন লাইন খোলার কাজ হচ্ছে। তারপর। তারপর আরগাডা। কয়লা-খনির অন্ধকার গহ্বর থেকে কয়েদখানার নিঝুম নিস্তব্ধতা।

ভাবতে বসলে সব ভালো করে মনেও পড়ে না লখিয়ার।

চুল্লীতে কাঠের জ্বাল বাড়িয়ে দিতে দিতে একবার উঁকি মেরে দেখলে। শাঁওন নেই কাছেপিঠে। সকালে সেই যে বেরিয়েছে ফেরে নাই এখনো।

হয়তো অনুশোচনা হয়েছে।

নিজের মনে হাসে লখিয়া। ও যে আগেভাগেই ঘরদোর সাফ করে রেখেছিলো, শাঁওনের বলার আগেই—এ-কথা শুনলে কী ভাববে শাঁওন? হয়তো দুঃখ হবে তার, ভাববে মানজারবাবুর সঙ্গে পেয়ার হয়েছে তার। ভাবলে ভালোই। তাই চায় লখিয়া। কেনা বাঁদী নাকি ও শাঁওনের, না বিয়ে করা জরু!

ফুটন্ত জলের ডেক্‌চিটা দু'হাতে ধরে চবুতরায় গিয়ে হাজির হলো লখিয়া।

আধ ডজন কেদারা পেতে বসে আছে ওরা। ব্রিজলাল, অনুপম, হাগিন্স সাহেব। আরো কয়েকজন! চেনা আর অচেনা।

—গরম পানি। অনুপমের চোখে চোখ্ রেখে লখিয়া বললে।

আর লখিয়ার যৌবনোচ্ছল দেহের দিকে মোহগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে হাগিন্স হঠাৎ বলে উঠলো, হিয়ার্স এ গেম ফর মিন

—আমার কুঠরিতে রাখবি যা অনুপম বললে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা চল, আমিও যাচ্ছি।

লখিয়ার পিছনে পিছনে এলো অনুপম।

ডেক্‌চিটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে লখিয়া বললে, চায় বানাবি বাবু?

—হুঁ, এগুলো ধুয়ে এনে দেতো, জল আছে ঐ বাল্‌তিতে।

লখিয়া মৃদু হেসে পেয়ালাগুলো ধুতে শুরু করলে।

এক ফাঁকে পিছন ফিরে অনুপমকে বললে, সাদি কর বাবু, খুবসুরত একটা জরু নিয়ে আয়, সে করবে এ কাজ।

অনুপম বললে, জরু আনতে হলে যা জরুরত তা যে নেই। রূপেয়া কোথায়?

—মানজারবাবুর রূপেয়া নেই? খিলখিল করে অবিশ্বাসে হেসে উঠলো লখিয়া।

—করবো সাদি, একটা ভালো মেয়ে এনে দে। বললে অনুপম।

—কোন কিসমের মেয়ে? মেমসাব না বাদশার বেগম?

—না। সুন্দর হবে, এই ধর্—

—লখিয়ার মতো? নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠলো লখিয়া। তারপর চট্ করে উঠে পড়লো।

অনুপম হেসে বললে, হাঁা, তোর মতো।

লখিয়া ফিরে দাঁড়ালো। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললে, খুনী আসামীর ঘর করি আমি।

অনুপম সহজ হবার চেষ্টা করে বললে, চা খাবি না?

লখিয়া উত্তর দিলে না। তর্ তর্ করে দ্রুত পায়ে চলে গেলো।

একটু পরেই এলো ব্রিজলাল।

এক মুখ হেসে বললে, সব ঠিক হয়ে গেলো অনুপমবাবু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে অনুপম।

—রূপেয়া লাগবে থোরাবহুৎ। আর—

—আর?

হাসলে ব্রিজলাল।—দু'দিন বাদ, এতো জল্দি কিসের। হাঁ, পান্শো রূপেয়া ইনাম মিলবে তোমার। কাজ হাঁসিল করলে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

জানালা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অনুপম। চোখ ছুঁড়ে দিলে বাইরের দুনিয়ায়। না-নিদ্ নিশীথের অন্ধকার আসমানে। দূরে কোথায় একটা ময়না না মুনিয়া শিস দিচ্ছে মেকি সুরে। আর ঠাণ্ডা বাতাস। দেয়ালের গা ঘেঁষে উঠেছে একটা কিশোর আমলকীর গাছ। সিরসির করে নড়ছে পাতাগুলো। নির্বাতি রাত। শব্দ নেই, নেই এতটুকু আওয়াজের লেশ। না, দূরের রেল লাইনে একটা মালগাড়ির শান্টিং ধ্বনি তুলছে। ঝন্ ঝন্ ক্যাঁচ কোঁচ নানা রকমের ভাঙা টুকরো শব্দ। হঠাৎ-জাগা কঙ্কালের প্রতি-অঙ্গের ঠক ঠক আওয়াজ উঠলো যেন।

লণ্ঠনটা জ্বেলে টেবিলে রাখা টাইমপীসটার দিকে তাকালে অনুপম।

না। সময় হয়নি এখনো।

হুস্ হুস্ শব্দ করে ইঞ্জিনটা এগিয়ে গেলো ? ছোঁ-মারা চিলের মতো দ্রুত। মাটিতে পা পড়ে না যেন।

ধোঁয়া দেখা গেলো না। শুধু খুচরো কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ বিপরীত-বাতাসে উড়ন্ত আঁচলের মতো পিছনে দুলতে দুলতে নিভে গেলো।

কুঁজোটা উপুড় করে তুলে ধরে ঢকঢক করে খানিকটা ঠাণ্ডা জল খেলো অনুপম।

জংশন-স্টেশন ছোটামুরীর বিশ্রামঘরে ব্রিজলাল হয়তো ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাচ্ছে এতক্ষণে। আর শাঁওন ? না, বিশ্বাসঘাতক নয় ও। জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে ব্রিজলালের জিনিসপত্তর। লাতেহার থেকে দূরে, আরগাডা থেকে দূরে। হ্যাঁ লখিয়ার কাছ থেকে অনেক দূরে।

রেলের স্লিপার পাসিং অফিসার এসেছে ইন্স্পেকশনে। নতুন ঠিকাদারীর লোভে ছায়ার মতো তার পিছনে পিছনে ঘুরছে ব্রিজলাল আর ব্রিজলালের পিছনে শাঁওন।

—খুনী আসামী ও।

লখিয়ার কথাটা মনে পড়লো। একটা কেমন যেন ব্যথা বোধ করলে অনুপম।

মায়া, মমতা, মোহ।

না। তার চেয়ে বড়ো টান বোধ করছে অনুপম। অন্য দিকে। কর্তব্য অপেক্ষা করছে তার পথ চেয়ে। রাত গভীর হয়ে আসুক। নিস্তব্ধ হয়ে যাক সারা দুনিয়া। তারপর।

কাবেরীর চোখে অশ্রুর কণা চকচক করছে। কাবেরী কাবেরী। কি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ, আস্বাদ-অনভ্যস্ত অপূর্ব এক মিষ্টতা। কাবেরী, কাবেরী।

বিছানায় শুয়ে পড়লো অনুপম। ঘুম নামছে না তার চোখে। না, ঘুম চায় না ও, ঘুমকে সরিয়ে রাখতে চায় আজ।

শার্টের বুকেতে লেগেছিলো দু'কোঁটা চোখের জল। বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনুপমকে আঁকড়ে ধরে থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো কাবেরী। কান্না রোধ মানাতে পারে নি।

অশ্রু দুফোঁটা শুকিয়ে গেছে, তখনই হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু। হ্যাঁ, আজও যেন বুকের সেই জায়গাটায় তপ্ত অশ্রুর আর্দ্র স্পর্শটুকু অনুভব করছে সে।

বুকের ওপর ভেঙে পড়ে কাবেরী জানিয়েছিলো, তার সুখের দিন শেষ হতে চলেছে। অনুপমকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করতে অনুরোধ জানিয়েছিলো সে। না, না—এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাহ-মিলনের ভার যদি তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয়, তা হলে—না, কাবেরী বাঁচতে পারবে না।

অনুপম ভরসা দিয়েছিলো, ভয় কি!

কাবেরীর সজল চোখ খুশীতে ভরে উঠেছিলো। আরো, আরো কিছু শোনবার আশায় মুখ তুলে তাকিয়েছিলো কাবেরী।

—সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারি, সব লোকসান সয়ে। কিন্তু, কোথায় যেতে চাও কাবেরী?

—যেখানে খুশী তোমার, যেদিকে ইচ্ছে। শুধু অনেক, অনেক দূরে।

আর ভাবতে পারে না। ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছে অনুপম।

ধীরে ধীরে ঘড়িটার কাছে সরে এলো অনুপম। কান পেতে পরীক্ষা করলে ঘড়িটা চলছে কি না। টিকটিক টিকটিক শব্দ শুনে সন্দেহ দূর হলো।

লখিয়াটা হয়তো ভিতু ভাববে অনুপমকে। হয়তো মনে মনে বলবে মরদ নও তুমি, জেনানার জান তোমার ছাতির নীচে।

বুকের একটা কোণে কেমন যেন খচ্ খচ্ করে লাগে।

—ছত্তিশগড়ের রয়তাইন আমি, মাট্টির পুত্‌লি নই।

তপ্ত নারীদেহের সক্ষম আলিঙ্গন অনুভব করছে যেন অনুপম, বুকের কাছে। তার সারা দেহ অবশ হয়ে পড়েছে, মুখের ওপর যেন নেমে আসছে উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের মদির নেশা। কিন্তু। লখিয়া নয়, কাবেরী। দেহ নয়, মনের ভিখারী সে।

লখিয়া দুঃখ পাবে। তা পাক্, কাবেরী এতক্ষণে হয়তো উঠে বসেছে। হয়তো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

কাবেরী। অনেক অনেক দূরে কোন এক অজানা দেশে নতুন ঘর বাঁধবে অনুপম। জানা শহরেও যেতে পারে। জনতার জঞ্জালে মিশে গিয়ে সংসার বাঁধবে।

আচ্ছা, লখিয়া কি ব্যথা পাবে? সত্যিই কি অনুপমকে ভালোবেসেছে লখিয়া? ভালোবাসা। মনে মনে হাসলে অনুপম, এমন উদ্ভট কল্পনাও তার মন জুড়ে বসতে পারে। পাহাড়ী নুড়ির মতো এখানে ওখানে ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক পথের স্পর্শ কুড়িয়ে নীচে গড়িয়ে পড়াই যার জীবন, সেও ভালোবাসবে। আর তাও কিনা অনুপমের মতো সরল পথের পান্থকে!

ভুল। অনুপমেরই মনের ভুল!

জ্বালার আগুন ওর চোখের তারায়, বুকে অরণ্যতুফান। শুধুই চলার উন্মাদনা, জীবনের উন্মাদনায় মানুষ লখিয়া। মুক্তির নেশাতেই ওর ঘর ভাঙা। পৃথিবীতে আরো মানুষ আছে, আরো বন্ধন, তা যদি জানতো লখিয়া। ও যেন একাই দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী। ওর ইচ্ছাই যেন আকাশ, মাটি, আলো। নাকি রোদ, বর্ষা, জনারের ক্ষেত তাদের প্রাণস্পন্দনের তিল তিল দিয়ে গড়ে তুলেছে লখিয়ার তিলোত্তমা মন? বেড়া মানে না, বাঁধ মানে না। কোন ঝুটা কানুন, কোন মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়বার মতো লাক্ষার কীট নয় ও, জালে জানালা বন্ধ হবার আগেই পায়ের সুতো কেটে ফেলতে ভয় পায় না, মুছে ফেলতে সময় লাগে না স্মৃতির পদচিহ্ন।

মাকং পাহাড়ের জঙ্গল বুঝি বা লখিয়ার মনকে ইজারা নিয়েছে। আরণ্যক আদিম-কন্যা লখিয়ার শরীরে শুধুই জীবনের উত্তাপ, মনের শোণিত শিরায় শুধুই প্রাণস্পন্দন।

তবু, কোথায় যেন একটা কোমল কামনার আশ্লেষ বোধ করছে অনুপম। লখিয়া। মধুর নয়, মনোরম নয় এ নাম। কি এক কঠিন দৃঢ়তা এই নামটিতে, কি এক অফুরন্ত যৌবনের ডাক।

—বাবুজী, বড় বেদর্দী মানুষ এই শাঁওন। ওর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে চল্ বাবুজী, ওর হাতে আমাকে একদিন না একদিন জখম হতে হবে হয়তো। চুল্লীতে বড়ো বড়ো ভিজে কাঠের জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে বলছিলো লখিয়া। আর সারা মুখ ওর ধোঁয়ায় আবছা হয়ে গিয়েছিলো বলেই সেদিন লখিয়ার চোখের জলকে চিনতে পারে নি অনুপম।

বলেছিলো, আমাকেও তো একদিন এমনি ছেড়ে পালাবি, হয়তো হাগিন্সের সঙ্গেই।

—আফসোস! সুর টেনে টেনে বলেছিলো লখিয়া, তারপর চোখে মুখে কৌতুকের হাসি ছিটিয়ে বলেছিলো, ডেরা বাঁধার আগেই ডর লাগার মেয়ে নই আমি। গাছ থেকে সর্বতী তোলবার আগেই খাট্টা হবে কিনা ভয়? সারা শরীরে হিল্লোল তুলে হেসেছিলো লখিয়া।

—কোলিয়ারীর ঐ হাগিন্স সাহেবটার যে নজর পড়েছে তোর ওপর।

—সে আর সমঝাতে হবে না, পয়লা দিনেই টের পেয়েছি আমি। মরদ লোকের দিল তার চোখের শিশায় দেখতে পাওয়া যায়।

অনুপম ঠাট্টার সুরে বলেছিল, মেয়েদের চোখে কিন্তু আয়না নেই, আছে দিল জখমী বল্লমের ভালা।

তবে আর ভয় কি, তেমন ইরাদা থাকলে না হয় ভালার

খোঁচাতেই কয়লা সাহাবকে খতম করে দোব। উত্তর দিয়েছিলো লখিয়া, চোখে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে।

হেসেছিলো অনুপম। ওর কথায়। বলেছিলো, মতলব বদলাতে কতক্ষণ। আমার মত কৌপীন ফকির কী ও। দৌলতওয়ালা হাগিন্স সাহেবের সঙ্গে পেরে উঠবে মোহব্বতের খেলায়।

উনুনে ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ কথাটা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো লখিয়া, তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখে তার একটা অদ্ভুত অবোধ্য কাঠিন্যের ছায়া পড়েছিলো।

—পিয়ারের আদ্‌মির সঙ্গে ভাগতে ভয় পাই না আমি। তা বলে রূপেয়ার লালচ্‌ আছে ভেবো না। মোহর নয়, মোহব্বৎ। পিয়ার। বলেছিল লখিয়া।

নাঃ, এসব কী ভাবছে অনুপম? ঘড়ির কাঁটার দিকে আরেকবার তাকালে সে। কাবেরী হয়তো এতোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এইবার, নিঃশব্দ পায়ে হয়তো বেরিয়ে আসবে। মনে মনে শেষ বিদায় জানাবে সকলকে। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াবে বাইরের ফাঁকা বাতাসে।

কাঁপতে কাঁপতে ভয়চকিত পায়ে এসে দাঁড়াবে কাবেরী। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গার্ডপোস্টের আড়ালে এসে। তারপর সুরু হবে ওদের যুগ্ম-যাত্রা।

—পানশো রূপেয়া ইনাম! কি আশ্চর্য্য, এখনো লোভের ইশারা ভাসছে ওর চোখের সামনে? নিজের মনেই হাসলে অনুপম এতো সস্তায় শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করবে ও, ভাবলো কি করে ব্রিজলাল। লখিয়ার যৌবনের মূল্য দিতে পারলো না, এই তো এক দুঃখ অনুপমের। হাগিন্স আর লখিয়ার মধ্যে ঘৃণ্য যোগসূত্র হবে ও? বদ্ধ উন্মাদ ব্রিজলালটা।

কিন্তু, বড়ো ক্লান্তি বোধ করছে অনুপম।

তা হোক্। কাবেরী অপেক্ষা করছে, কর্তব্য পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। ঐশ্বর্য্য চায় না ও, চায় প্রেম।

অনুপম উঠে দাঁড়ালো।

মিঠে রাগিণীতে সান্ধ্যসানাইয়ের সুর ভেসে চলেছে। অবিরাম কেঁদে চলেছে বিরহী বাঁশীর সুর।. সানাই বেজে চলেছে।

বাড়ির দক্ষিণে, বাগানের ওপাশে খানিকটা মাঠ ঘেরা হয়েছে তেরপলে। লাল শালুতে মোড়া বিবাহমঞ্চ। কারবাইডের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে সারা মণ্ডপ। লাল·মেঘের উন্মাদনা এনেছে রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদন। ওপরে মখমলের চাঁদোয়া। একটা বিরাট চক্র রং বদলে বদলে কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়ে গেছে ঠিক্ মাথার ওপর এদিকে ওদিকে ঝুটা মোতির ঝালর।

সানাইয়ের সুর থামছে না, দূরবন্ধু চক্রবাকীর কণ্ঠকাকলীর মত ককিয়ে কেঁদে উঠছে যেন।

কাবেরীর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কান্না নেই, দুঃখ নেই। যেন সব চিন্তা, সকল ব্যর্থতার ব্যথা চাপা পড়ে গেছে আজকের এই উজ্জ্বল জোছনায়। আনন্দের উন্মত্ততায়।

একদল মেয়ে উঠে পড়ে লেগেছে কাবেরীকে সাজিয়ে তুলতে। বেনারসী শাড়ির ফাঁকে কাবেরীর সুন্দর মুখখানা কেমন মৌনবিষাদে ভরা। তবু, কত অপরূপ রূপের প্রকাশ। চন্দনের ফোঁটায় সাজানো ছোট মুখখানা নেড়েচেড়ে দেখছে মেয়েরা। কৌতুকহাস্যে নয়তো নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই লুটিয়ে পড়ছে।

খুশীতে অধীর যেন সকলে।

শুধু রাজেনবাবুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসছে। ক্ষণে ক্ষণে চশমার কাচ মুছছেন। আর কাবেরীর মা চেষ্টা করছে সকলের সঙ্গে হেসে কথা কইবার।

অমিতাভ হঠাৎ বললে, করেছিস কি দিদি। এ যে রাজসিক ব্যাপার। এত দানসামগ্রী এই বাজারে ?

রাজেনবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন, আমার একটা পোজিশন্ আছে তো। না করলে চলবে কেন? আমার খ্যাতি সুনাম বংশগৌরব—

বাধা দিয়ে অমিতাভ বললে, খরচটার দিকেও তো একটু চোখ রাখতে হয়। টাকা জিনিসটা থাকলেই যে জলে ফেলে দিতে হবে, তা তো নয়।

রাজেনবাবু মৃদু হাসলেন। কাপড়ের খুঁটটা চোখে রগড়ে নিলেন, যেন কী একটা পড়েছে এমনি ভান করে। তারপর বললেন, সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি আমার কাবু মাকেই যখন—

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কী যেন কাজ মনে পড়ায় ছুটে গেলেন।

মা'র দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেলো কাবেরী।

ওর চিবুকটা নরম করে তুলে ধরে কাবেরীর মা বললে, ছিঃ মা, কাঁদতে নেই আজ। কাঁদতে নেই, চোখ মোছো। বলে নিজেই চোখ মুছলে।

কাবেরীর হঠাৎ মনে হলো, মাকে সে কত ভালোবাসে। মা, বাবা—সকলকে।

হ্যাঁ। আর একজনের কথা মনে পড়ছে। অনুপম কি ওকে ক্ষমা করতে পারবে ? কে জানে। একটা অসহনীয় গভীর দুঃখের মোচড় অনুভব করে কাবেরী, তার ছোট্ট বুকে উথলে ওঠে ব্যর্থতার বাষ্প।

সেদিন হয়তো সারা রাত কাবেরীর অপেক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছে অনুপম। কে জানে। কাবেরী মনে মনে বললে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। এ ছাড়া যে উপায় ছিলো না। ক্ষমা করো তুমি!

লাল বেনারসী, প্রসাধিত রূপ। কপালে চিত্রচন্দন, সিঁথিতে

মুক্তোর সিঁথিময়ুর। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে কাবেরাকে। নতুন ফোটা গোলাপের মতো।

ধীরে ধীরে উঠে এসে পুবের খোলা জানালায় দাঁড়ালো কাবেরী। ঠাণ্ডা গরাদের ফাঁকে গাল দুটো চেপে। তারপর একবার হঠাৎ তাকালে ওপারের আকাশে।

একটা বড়ো তারা উঠেছে আকাশের কোণে।

—আমার খ্যাতি, সুনাম, বংশগৌরব।

রাজেনবাবুর কথাটা, হ্যাঁ, কথাটা কেমন যেন পুরোনো ঠেকলো কাবেরীর কানে। অনেক, অনেক পুরোনো। তবু, কেমন যেন নতুন মনে হয়!

দূরের অন্ধকারে এগিয়ে আসছে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। একখানা মোটর ছুটে আসছে এদিকে। কাবেরী সরে এলো।

না। কাবেরীর দিকে ওদের চোখ নেই।

তুফানের বেগে ছুটে চলেছে ব্রিজলালের নীল রঙের মোটরখানা। হাউই থেকে খসে পড়া ফুল্‌কির মতো দ্রুত বেগে।

হাগিন্স সাহেবের বাংলোর পথে ছুটে চলেছে।

অকস্মাৎ-সানাইয়ের শব্দে চমকে উঠলো অনুপম। দূরের মণ্ডপ থেকে ঝলমলে আলোর কয়েকটা সূক্ষ্ম রশ্মি এসে পড়েছে বাইরের মাঠে। সানাই বেজে চলেছে।

নিজেরই অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে অনুপম। লখিয়া চমকে তন্দ্রাজড়িত চোখ তুলে তাকালে অনুপমের দিকে। তারপর ঘুমের ঈষৎ ঘোরে মৃদু হেসে আরো কাছে সরে এলো। আরো নিবিড় করে আঁটলে আপন আলিঙ্গনে, অনুপমের কাঁধের ওপর মাথা ঢলে পড়লো। বেহুঁশ হয়ে। তাড়ির নেশায়।

কাবেরী হয়তো কাঁদছে। সত্যি, এত আন্তরিক ভালবাসার কোন প্রতিদান দিতে পারলে না অনুপম। দিতে পারলে না কাবেরীর

বিশ্বাসের মর্যাদা। তা হোক্। এই ভালো। শুধু একটা মুহূর্তের ভুলে কি না হতে পারতো! সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়লো। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো অনুপম আর একটু হলেই। তারপর?

কাবেরীর জন্যে অনুপম দুঃখের মোচড় অনুভব করে। হয়তো, কে জানে, হয়তো সেদিন সারা রাত্রি নিস্তব্ধ নিশীথের অন্ধকারে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে গুনে কাটিয়েছে কাবেরী। অনুপমের দেখা পায় নি। ব্যর্থতার বিরহ বুকে নিয়ে হয়তো ফিরে গেছে শেষ রাতে।

চলন্ত মোটর থেকে দূরের আকাশের দিকে তাকালে অনুপম।

আকাশের কোণে একটা বড়ো তারা উঠেছে।

পান্‌শো রুপেয়া ইনাম আর ব্রিজলালের বেসাতিতে এক আনা অংশ। হাগিন্স সাহেবের বাংলো বেশী দূরে নেই আর।

হেডলাইটের আলোটা চোখে পড়লো হাগিন্সের। চমক্ ভাঙলো যেন তার।

স্বপ্নাবিষ্ট চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে যেন। চেষ্টা করে চোখ তুলে তাকালে হাগিন্স। অদূরের চলন্ত মোটরের আলোর প্লাবন পড়েছে যেদিকে। তারপর দৃষ্টিটা ঘুরে এলো ঘরের ভেতর। সার্চলাইটের মতো চোখ বুলিয়ে গেলো সে ঘরের প্রতিটি কোণে, প্রতিটি সামগ্রীর ওপর।

ছোট্ট গোল টেবিলটার ওপর হুইস্কির বোতল জমে উঠেছে। বোতলে ডিকেণ্টারে ঠোকা লেগে ঠুং করে আওয়াজ হলো একটা।

আরাম কেদারায় এলিয়ে বসেছিলো হাগিন্স। হঠাৎ টলে ঝুঁকে পড়লো গোল টেবিলের ওপর। কনুয়ে ভর দিয়ে।

সুরার নেশায় সব কিছু ভুলে গেছে হাগিন্স। ঘামে ভেজা কপালের ওপর খুচরো কয়েকটা তামাটে চুল স্প্রিংয়ের মতো

পাক খেয়ে লেপটে আছে। চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা।

হাগিন্স চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। একদৃষ্টে নিঃশেষ বোতলটার দিকে চেয়ে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে নিজের মনে।

—রীচেস্? ওয়েল্থ? নিজের মনকেই যেন প্রশ্ন করলে হাগিন্স।

হঠাৎ একটা হাতের ঝট্কা টানে ফেলে দিলে ফাঁকা বোতলগুলো। ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে কাচের টুকরোগুলো ভেঙে গুড়িয়ে গেল।

—রেসপেক্টেবিলিটি? ডিগনিটি? অনার?

কিছুক্ষণ তন্দ্রাতুর নেশার চোখে চেয়ে দেখলে কাচের টুকরো গুলোর দিকে। নিঃশব্দে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইলো। অনেক দূর থেকে, বহুদূর থেকে কি যেন মিঠে মিউজিকের সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে। বাতাসের গমকে গমকে আশ্চর্য এক মন মাতানো অর্কেস্ট্রার অনুরণন বেজে উঠেছে।

সুরে সুর মিলিয়ে শিস দিতে দিতে উঠে এলো হাগিন্স। ভিনিশিয়ান জানালার শাটারটা সরিয়ে দিলে। জানালার ধারে ঠেস দিয়ে তাকালে বাইরের পৃথিবীর দিকে। নিঃসীম অন্ধকারের দিকে। আকাশের দিকে।

ইউকেলিপটাস গাছের সাদা গুঁড়িটার পাশে একটা বড়ো তারা উঠেছে।

হঠাৎ একটা গানের কলি ভেঁজে উঠলো হাগিন্স।

—ফর মাই লাভ, ফর মাই লাভলি ইয়াং লে-ডি।

পাশের বাংলোর রেডিওতে বিলিতি গান বেজে উঠলো।—ডে-জি. ডে-জি।

পৃথিবীর আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ হয়তো দেখা

দেবে। আর এক কোণে তিনটে বড়ো বড়ো তারা। রাত হয়তো আরো বাড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে সারা ছুনিয়া। রাজেন ডাক্তার, ব্রিজলাল, হাগিন্স। কাবেরী, অনুপম, শাঁওন। আরও অনেকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়বে। শুধু জেগে থাকবে আকাশের প্রান্তে তিনটে বড়ো বড়ো তারা।

খ্যাতি, ঐশ্বর্য, প্রেম।

